মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা

চান্দামারী মসজিদ। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার রাজারহাট ইউনিয়নের মন্ডলপাড়ায় অবস্থিত। সড়কপথে এটি রাজারহাট উপজেলা থেকে ৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তিন গম্বুজ ও তিন মিহরাব বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন মোগল আমলের এই মসজিদটির নির্মাণকাল আনুমানিক ১৫৮৪-১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। মসজিদটির নির্মাণশৈলীতে সুলতানী আমলের শিল্পবৈশিষ্ট্য ও মোগল স্থাপত্যকলার সমন্বয় ঘটেছে। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ২০ ফুট। এর নির্মাণ কাজে ভিসকাস নামে এক ধরনের আঠালো পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের সামনের দিকে পাঁচ ফুট উঁচু তিনটি বড় দরজা রয়েছে।

চাঁদ খাঁ মসজিদ। চাঁদ গাজী ভুঞার মসজিদ নামেও পরিচিত এই মসজিদটি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার চাঁদপাজীতে অবস্থিত। হিজরি ১১১২ সালে জনৈক চাঁদ গাজী ভুইয়া নামক এক ব্যক্তি ২৮ শতক জমির ওপর এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এক সারিতে তিনটি গম্বুজ অবস্থিত, যার মধ্যে মাঝখানের গম্বুজটির আকার অন্য দুটি গম্বুজের তুলনায় বড়। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গম্বুজের উপরে পাতা এবং কলসের নয়নাভিরাম নকশা করা হয়েছে। এছাড়া একই ধরনের স্থাপত্যশৈলীর ১২টি মিনার রয়েছে এবং দরজার উপরে টেরাকোটার নকশা রয়েছে। মসজিদের সামনের অংশে শ্বেতপাথরের নামফলকে এর বর্ণনা রয়েছে।

বীরশ্রেষ্ঠদের স্বপ্ন নবপ্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা

ইতিহাসের যে ঘটনা কিংবদন্তিকেও হার মানায়, সেটা গর্ব করে বলার বিষয়, নিছক তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। কিংবদন্তির বাড়া। সে অর্থে গল্প। বাঙালি চিরকালের ঘরকুনো, মাটি আঁকড়ে পড়ে-পড়ে মার খেয়েছে বহুকাল। এতকাল ধরে যে সেটাই হয়ে উঠেছিল তার পরিচয়।

একাত্তরের বীরশ্রেষ্ঠরা বাংলাদেশের চিরকালের নায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সেসব রুদ্ধশ্বাস সমরে তাঁদের বীরোচিত আত্মত্যাগ আমাদের চিরন্তন প্রেরণা জোগায়।

বাংলা ভূমির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ এক অনন্য মাইলফলক। এর আগেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রে বাঙালি বিভেদ ভুলে এক হতে শুরু করেছিল। পরে নেতৃত্বের জাদুকরি শক্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন এক ব্যতিক্রমী নেতা। আর বাংলা ভাষার এমন জাদু যে তাঁর গুণে সব বিভাজন ভুলে এক জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এ দেশের জনমানুষ। একাত্তরে 'এক নেতা এক দেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ'–এই ছিল তাঁর পরিচয়। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'–এই তাঁর অহংকৃত ঘোষণা। সেদিন এক মন্ত্রে সবাই ছিল উজ্জীবিত–'জয় বাংলা'। বাংলার জয় সেদিন হয়েছে। আবির্ভূত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

দুই

বাংলাদেশ একটি স্বপ্নের নাম। বহু মানুষের স্বপ্ন-সাধের দেশ এই বাংলাদেশ।

যদি প্রশ্ন ওঠে কার স্বপ্ন? কত মানুষের স্বপ্ন? তবে হাতের কাছে কাজ চালানোর মতো উত্তর মিলে যায়, সেই সব মানুষের, যাঁরা এর জন্য আন্দোলন চালিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন।

একটু গুছিয়ে বলা যায়, সেই বায়ান্ন থেকে যে ভাষার লড়াই, চুয়ান্নতে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতির প্রত্যাখ্যান, বাষট্টির গণতান্ত্রিক শিক্ষার আন্দোলন, ছেষট্টির স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আটষট্টির সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের সংগ্রাম, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনী রায়, একাত্তরের অসহযোগ ও মুক্তিযুদ্ধ–এসবের ধারাবাহিকতায় এসেছে স্বাধীনতা, ঘটেছে স্বপ্নসাধের পূরণ। বাংলাদেশ অযুত মানুষের দান। কিংবা বলা যায়, অসংখ্যের এক স্বপ্নময় নির্মাণ।

এই অসংখ্য অযুতজন কারা? কতজন?

ইতিহাসের যে চুম্বক-ছক এঁকেছি, কেবল কি এই সব ঐতিহাসিক মাইলফলকের নির্মাতা অনুসারী ও নেতাদের অবদান এই স্বাধীনতা? ইদানীং যেভাবে উচ্চারিত হয়–একি শুধু সেই একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় সৃষ্টি? বা কেবল কি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশের, সীমাভুক্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী লড়াকু মানুষের ধারাবাহিক যৌথ অর্জনের ফল?

প্রশ্ন আমাদের ইতিহাসের মুখোমুখি করে, আমাদের অব্যক্ত আবেগকে স্বপ্নের স্ফূর্তি দেয়। আমরা বলি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এই বাংলার স্বাধীনতা এসেছে। পিঠাপিঠি অনুক্ত আবেগ হলো–এক আকাশ স্বপ্নের বিনিময়ে মিলেছে এমন স্বাধীনতা।

এ কেবল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা, সংগ্রামী রাজনীতিক, লড়াকু কর্মী, সচেতন নাগরিকের আরাধ্য ছিল না। ছাত্র-তরুণ, কৃষক-শ্রমিক, গৃহস্থ-গৃহহীন, প্রবীণ-নবীন, নারী-কিশোর–কেউই এই স্বপ্নের দোলায় ও স্বাধীন স্বদেশের সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এর প্রেরণায় উজ্জীবিত না হয়ে পারেননি।

তিন

ইতিহাসের যে ঘটনা কিংবদন্তিকেও হার মানায়, সেটা গর্ব করে বলার বিষয়, নিছক তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। কিংবদন্তির বাড়া। সে অর্থে গল্প। বাঙালি চিরকালের ঘরকুনো, মাটি আঁকড়ে পড়ে-পড়ে মার খেয়েছে বহুকাল। এতকাল ধরে যে সেটাই হয়ে উঠেছিল তার পরিচয়।

একাত্তর সেই দুর্নামের প্রত্যুত্তর। যোগ্য জবাব। একাত্তর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী বছর। সেদিন ভেতো বাঙালি বীর বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোন্দলপ্রবণ জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশাল শক্তিতে জেগে উঠেছিল সেদিন। বাঙালি জাতি হিসেবে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার জন্য লড়েছে পূর্ব পাকিস্তান। জয়ী হলে তার পরিচয় হবে বাংলাদেশ।

অবশেষে অসংখ্য হত্যার বিভীষিকা, অগণিত লাশের ফরিয়াদ, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, অশ্রু–সবকিছুর জবাব ১৬ ডিসেম্বর। ভেঙে গেল পাকিস্তান। অসার খোলস হয়ে পড়ে রইল বিজয়ীর পদতলে। গ্লানি ঝেড়ে যে মাথা তুলে দাঁড়াল, সে বাংলাদেশ। সদ্যোজাত দেশ। যুদ্ধে বিধ্বস্ত কিন্তু বিজয়ীর হাসিটি তারই মুখে। লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই হাসির পেছনে অশ্রু যেমন আছে, তেমনি আছে মৃত্যু ও ত্যাগের মহিমা। সেই মহিমান্বিত চিত্রপটে জ্বলজ্বল করছে শত শহীদের নাম। বহুমূল্য মণিমুক্তার মতো ভাস্বর বীরশ্রেষ্ঠদের অবদান।

চার

আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ আছেন সাতজন। তাঁরা সবাই একাত্তরে রণাঙ্গনের শহীদ। ছয়জন এই বাংলাদেশে হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, একজন বৈমানিক পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হয়েছেন পশ্চিম রণাঙ্গনে। সব মুক্তিযোদ্ধাই প্রাণ বাজি রেখে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁদেরও অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন সেদিন। স্বাধীনতাযুদ্ধে বীর বাঙালির অকুতোভয় আত্মত্যাগের যে মহিমা একাত্তরে প্রকাশ পেয়েছিল, বীরশ্রেষ্ঠ সাতজন যেন তারই মহিমান্বিত প্রতীক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহিমান্বিত প্রতীকগুলো ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তাঁরা পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্ব পাচ্ছেন, কিছু কিছু স্থাপনায় তাঁদের নামাঙ্কিত হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর দিনে কিংবা জাতীয় দিবসে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। তবে যাঁরা দেশের জন্য ইতিহাসের গৌরবলগ্নে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় নিজেদের স্বীকৃতির তোয়াক্কা করেননি। তাঁদের ভাবনায় ছিল শত্রু নিধন, দেশকে দখলমুক্ত করে স্বাধীন করা। তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, বিনিময়ে দেশও হয়েছে স্বাধীন।

স্বাধীন দেশের কাছে কী প্রত্যাশা ছিল বীরশ্রেষ্ঠ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর? তার কিছু প্রকাশ ঘটেছিল বাহাত্তরের সংবিধানে। কিন্তু পঁচাত্তরের প্রত্যাঘাতের পর প্রথমে সংবিধানই স্থগিত হয়ে গেল, মানুষের মৌলিক অধিকার হলো খর্ব, তারপর সংবিধান থেকে বাদ পড়ল সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা। এবার মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার সহযোগিতায় পুনর্বাসিত হলো একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা, ধীরে ধীরে তারা শক্তি সঞ্চয় করল, তার ফলে সমাজের অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ নষ্ট হতে থাকল। আজ নানামুখী উন্নয়নের মধ্যেও আমরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে গেছি। হ্যাঁ, আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে অনেকখানি, প্রায় ১ হাজার ৬০০ ডলারে পৌঁছেছে, গড় আয়ু ৭০ ছাড়িয়েছে, প্রাথমিকে ভর্তি প্রায় শতভাগ হচ্ছে, মেয়েদের ক্ষমতায়নও চোখে পড়ার মতো। এ ছাড়া পদ্মা সেতু, উড়ালসড়ক, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি মিলিয়ে অবকাঠামোর উন্নতিও বুক ফুলিয়ে বলার মতো। কিন্তু এত উন্নতির মধ্যেও দেশ যেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে গেছে। বাঙালির উদার মানবতাবাদী সমাজে সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি ধর্মীয় কট্টরপন্থা ও ইসলামী জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে, সমাজে ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা বেড়েছে, সন্ত্রাস ও সহিংসতা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে, গণতন্ত্র ও সুশাসন কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়ে চলেছে। নিশ্চয় বীরশ্রেষ্ঠ ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা এ কারণে প্রাণ দেননি। সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে, মুক্তিযুদ্ধ যে স্বপ্নে একটি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল, দেশ আজ অনেক দিন সেই পথে চলছে না। উন্নতি হচ্ছে বটে, কিন্তু সে কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফসল? বীরশ্রেষ্ঠদের ত্যাগের মহিমা কি প্রকাশ পাচ্ছে এ দেশে?

পাঁচ

দেশ জয়ী হয়েছে, বিপুল রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পতাকাও ওড়ে মাথা উঁচিয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ আর ৩০ লাখ শহীদের স্মৃতিও থাকে অম্লান। একাত্তরে ঘটেছিল মানবের জাগরণ। কিন্তু একসময় কোন দিক থেকে খেয়ে এল ভাটার টান, বুঝে ওঠার আগেই আসে পঁচাত্তরের কালরাত। ক্রমে ম্লান হতে থাকে একাত্তরে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো নির্ভীক জাতির ভাবমূর্তি। সেদিনের সেই মহান উত্থান অতীতের স্মৃতিতে বিবর্ণ হতে থাকে। ধর্মান্ধতা ছাপিয়ে ওঠে বাঙালির হাজার বছরের উদার মানবতার ধারাকে, জন্ম নেয় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস।

আজ বিজয় দিবসে একাত্তরের সব অর্জন মস্ত বড় প্রশ্ন হয়ে পথরোধ করে দাঁড়ায়–মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতি ও ব্যক্তিজীবনে কতটা টেকসই হলো? জাতির এই গৌরব যেন চিত্রপট হয়ে পেছনে সরে যাচ্ছে ক্রমেই।

ছয়

এটা ঠিক, মুক্তিযুদ্ধের প্রায় অর্ধশত বছর পরে আমরা নতুন কালান্তরে এসে উপনীত হয়েছি। পৃথিবী তথ্যপ্রযুক্তির নানা উৎকর্ষে মানুষের সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিচ্ছে। এ-ও মানুষের মুক্তির অভিযাত্রায় নানামাত্রিক ভূমিকা পালন করছে। আমরা আশা ও স্বপ্ন নিয়ে লক্ষ করছি, একালের তরুণসমাজ নতুন ভাবনায় জেগে উঠছে। তারা পৃথিবীকে, এ কালকে এবং নিজের দেশ ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে নতুন স্বপ্নের নতুন সম্ভাবনার কথা বলছে। সেসব কথা শোনা যাচ্ছে, তাদের সফলতার অনেক দৃষ্টান্তও দেখা যাচ্ছে।

বীরশ্রেষ্ঠরা একটি দেশের জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা আমাদের কালের ও বাংলাদেশের চিরকালের নায়ক। আর নতুন কালের নায়কদের পদধ্বনিও আমরা শুনতে পাচ্ছি।

আর সেখানেই বাংলাদেশের সম্ভাবনা, সেখানেই আমাদের আশা ও স্বপ্নের বসতি। বাংলাদেশ তার নবপ্রজন্মের হাত ধরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

॥ আবুল মোমেন

প্রথম আলো ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে বাংলাদেশ

দেশ স্বাধীন হওয়ারও ১০ বছর আগে ১৯৬১ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে নেওয়া হয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ। প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয় ২৬০ একর জমি। ১৯৬৪ সালে জাহাজে করে আনা হয়েছিল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও। কিন্তু পাকিস্তান সরকার জাহাজটি চট্টগ্রামের পরিবর্তে করাচিতে নিয়ে যায়। রূপপুর থেকে প্রকল্প সরিয়ে করাচিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পরে বিনিয়োগকারী দেশ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের নানামুখী শর্তের কারণে পাকিস্তানেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অপূর্ণ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ২০১০ সালে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর পাবনার রূপপুরে দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণ করতে রাশিয়ার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই করে বাংলাদেশ সরকার। চুক্তি বাস্তবায়নের সময়কাল ধরা হয় সাত বছর। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালে এবং দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৪ সালে উৎপাদন শুরু করবে।

কেন এই উদ্যোগ

আমাদের দেশে বিদ্যুতের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি মেটাতে পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চীন, ভারত, কোরিয়াসহ এশিয়ার বেশিরভাগ জনবহুল দেশ পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপন করেছে ও করছে। বিদ্যুৎ একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। দেশের অর্থনীতির সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক ওতপ্রোত হলেও জনসংখ্যার মাত্র ৬০ শতাংশ বিদ্যুতসেবা পায়।

বর্তমানে বিশ্বের ৩০টি দেশে ৪৪৯টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় ১২ শতাংশ। ১৪টি দেশে আরো ৬৫টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণাধীন। ২০২৫ সাল নাগাদ ২৭টি দেশে ১৭৩টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর মধ্যে ৩০টি পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্রই নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিশ্বে নবাগত দেশগুলোতে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বর্তমানে ২১টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লি চালু রয়েছে। নির্মাণাধীন রয়েছে ছয়টি। চীনে বর্তমানে ৩০টি পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি রয়েছে। নির্মাণাধীন ২৪টি। দেশটি ২০২০ সাল নাগাদ ৩০ হাজার মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হলে সেটি দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হবে—এমন আশাবাদ সংশ্লিষ্টদের।

কত খরচ হবে

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয় সরকারি হিসাবে এক লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। তবে এই ব্যয় আরো বাড়তে পারে। অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে সই হওয়া চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয়

নির্ধারিত হয়েছিল এক লাখ এক হাজার কোটি টাকা। শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল, সেটাই এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয়। তবে পরে দেখা যায়, প্রকল্পে বহু লুক্কায়িত ব্যয় (হিডেন কস্ট) রয়েছে। এ প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ের কাজ-সমীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, নকশা প্রণয়ন, কিছু ভৌত অবকাঠামো তৈরি প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয় প্রায় চার হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এটা হিসাবে ধরে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি। রাশিয়া এই টাকার ৯০ শতাংশ ঋণ হিসেবে বাংলাদেশকে দিচ্ছে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জোগান দেবে সরকার। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে ব্যয় বাড়লে তা সরকারকে বহন করতে হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের রাশিয়ায় তিন বছরমেয়াদি মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং পাঁচ বছরমেয়াদি স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পরের কয়েক বছর প্রকল্পটি রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা করবে রাশিয়া।

নিরাপত্তা

জাপানের ফুকুশিমা আর রাশিয়ার চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরে নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার সঙ্গে সই হওয়া চুক্তি অনুসারে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে মস্কোর সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি 'ভিভিইআর ১২০০'। বিশ্বের পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র নিয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো মাথায় রেখেই রাশিয়া তার সর্বশেষ মডেলের আধুনিকায়ন করে। আর তাই সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই বাস্তবায়িত হচ্ছে রূপপুর প্রকল্প। রাশিয়ার নবোভরনেজ ও লেনিনগ্রাদে ভিভিইআর ১২০০ মডেলটি চালু করা হয়েছে। শিগগির তা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশটির জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। ভবিষ্যতে তুরস্ক ও ফিনল্যান্ডসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশে এটি ব্যবহার করা হবে। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করার সক্ষমতা রয়েছে এই মডেলটির। আর পাবনা জেলায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প হলো ৭.৮ রিখটার স্কেল। বাংলাদেশের ভূমিকম্পের ইতিহাসে এই মাত্রার ভূমিকম্প বিরল। রাশিয়া বলছে, এই মডেলটি যে-কোনো ধরনের বিমান হামলা থেকেও রক্ষা পেতে সক্ষম।

॥ তামান্না মিনহাজ
কালের কণ্ঠ ৬ ডিসেম্বর ২০১৭

মধ্যপন্থাই সেরা পন্থা

ইংরেজিতে একটা কথা আছে Excess of anything is bad অর্থাৎ কোনো কিছুর বাড়াবাড়িই খারাপ। মাত্রা অতিক্রম করলে অনেক ভালো জিনিস মন্দ রূপ বা আকার ধারণ করতে পারে। যেমন মাত্রা অতিক্রম করলেই সাহস হঠকারিতায়, আত্মোৎসর্গ আত্মহত্যায়, প্রতিযোগিতা হিংসায়, ধর্মভীরুতা ধর্মান্ধতায় পরিণত হতে পারে। নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রা যেমন সকলের পছন্দ তেমনি সুরের মধ্যে পঞ্চম স্বরই মিষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বার বার বলেছেন তোমরা কোনো কিছুতেই সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না। লোকমান হাকিম তার ছেলেকে উপদেশছলে বলছেন, মাটিতে হাঁটবে মধ্যম মেজাজে আর তোমার স্বর হওয়া উচিত মোলায়েম–স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই নিকৃষ্ট।'

প্রত্যেকের উচিত খাওয়াদাওয়া, চাওয়াপাওয়া, চিন্তাচেতনা, আশাপ্রত্যাশা, আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে একটা পরিমিত বোধ মেনে চলা। ক্যানভাসের রং ও তুলির সুষম সমন্বয়ে শিল্পের সার্থকতা ফুটে ওঠে। পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর পরিমিত অবস্থান ও শৃঙ্খলামন্ডিত উপস্থাপনার মধ্যেই সৌন্দর্যের যথার্থ বিকাশ। নিয়মনিষ্ঠা পালন ও সহনশীলতা প্রকাশ যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে দান করে এক অনুপম মর্যাদা। অধিক ভোজনেই অধিকাংশ রোগ বালাইয়ের কারণ। পরিমিত আহার শরীর ও মনের জন্য অপরিহার্য। মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা সরবরাহে সমস্যা সৃষ্টি করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিশ্রমে মন ও শরীর ভেঙে পড়ে। অতি কথনে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। অতিরিক্ত সবকিছু খারাপ। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নামে একটি প্রবাদ চালু আছে।

বাড়াবাড়ির ফলাফল কখনই সুখকর হয় না। অতি উত্তেজিত ব্যক্তির হার্টবিট ও রক্তের চাপ বাড়ে। অতি দ্রুত চলাচলকারী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমূহ বিপদের কারণ ঘটাতে পারে। চলনে বলনে আচার ব্যবহারে কর্মকাণ্ডে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই সেরা অভ্যাস বলে বিবেচিত।

আনন্দ-সর্বনাশের অধিক উচ্ছ্বাস কিংবা অতি শোকে কাতর হতে নেই। আনন্দের পরে বিষাদ আসছে আর বিষাদের পর আনন্দ আসবেই এই বোধ ও বিশ্বাসে সকল পর্যায়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা রাখার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। ভগবদ গীতায় (অধ্যায়-২ শ্লোক-১৫) যেমন বলা হয়েছে 'O best (Arjuna), the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation.'

প্রত্যেকেরই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্যে পরিমিতি বোধ থাকা চাই। আমি বা আমরা যা পরি যা আমাদের প্রাপ্য তার বেশি করতে যাওয়া বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টার নানান

বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আহারের ক্ষেত্রে কথাটা আরো বেশি খাটে। অধিক আহার শরীরকে সবল করার পরিবর্তে শরীরেই নানান সমস্যার জন্ম দেয় আবার অতি অল্প আহার শরীরকে দুর্বল করে দেয়। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আহার করা উচিত। অতি শ্লথ গতির গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছাতে যেমন বিলম্ব করে তেমনি অতি দ্রুত গতির গাড়ি গন্তব্যে হয়তো আদৌ নাও পৌঁছাতে পারে। ধীরগতি কচ্ছপও অতি দ্রুতগামী সেই খরগোশের কাহিনি আমরা জানি। কচ্ছপের ধীর ও পরিমিত গতির কাছে তার পরাজয় ছিল নিশ্চিত। অতি বর্ষণে বন্যা হয়, অধিক শীতে সবাই কাতর হয়, অতি গরমে হাঁসফাস করে সবাই। সবাই স্বপ্ন থাকে বসন্তের বাতাস, নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ, পরিমিত বর্ষা আর মধ্যম বা পঞ্চম সুরের গান।

পথ্যপন্থা অবলম্বনে বিপদের ঝুঁকি কম। মধ্যম অবস্থানে থাকলে উঁচু মাত্রায় উঠতে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি নিচু মাত্রায় নামার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয় না। অথচ অতি নিম্ন মাত্রায় থাকলে তাকে মধ্যপন্থা পেরিয়ে উচ্চ পন্থায় যেতে বেশ বেগ পেতে হয়। আবার উচ্চ পন্থা থেকে মধ্যপন্থা হয়ে নিম্নপন্থায় নামতেও বেশ বিব্রতকর হতে হয়। বিশ্বাসও বয়ানে মধ্যপন্থা নিরাপদ সুশ্রাব্য। কোকিলের স্বর পঞ্চম ও মধ্য মানের তাই এত মিষ্ট। পক্ষান্তরে কাকের স্বর সপ্তম, কর্কশ তাই সুশ্রাব্য নয়। মধ্যপন্থার সুর বা স্বর সহজে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে উচ্চ গ্রামের গান বা কথাবার্তা অশ্রাব্য ও ঝগড়া বাদানুবাদের ভাষা। চরম অবস্থান গ্রহণে সহজেই সমঝোতা হয় না। সমাধান খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়। মিষ্টি সুরের গান বা কথা সবসময়ই মোলায়েম ও কোমল প্রশান্তির পরিচয় তুলে ধরে আনন্দ ও উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করে।

জীবন যাত্রার সকল পর্যায়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা রয়েছে। সম্পদ সসীম বা সীমিত অথচ চাহিদা অসীম বা অবারিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম চাহিদা মেটাতে সকলকে পরিমিতিবোধ মেনে চলতেই হয়। সময়ও সীমাবদ্ধ। করণীয় অনেক কিছু। স্বল্প সময়ের সদ্ব্যবহার করতে যেয়ে বিচক্ষণতার বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে অতি ধীরে কিংবা অতি দ্রুততার সাথে কোনো কিছু করতে চাওয়া বা করতে যাওয়ায় সমস্যা হয়েই থাকে।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব, ইআরডি ও চেয়ারম্যান এনবিআর
মেম্বার, গভর্নিং বোর্ড, এইচডিএফ

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা

বিগত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতির রূপান্তর, এককথায় বিস্ময়কর। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের পর্দা স্তরে স্তরে উন্মোচিত হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি খাত (শিল্প, সেবা ও কৃষি) একই লয়ে পাশাপাশি বেড়ে চলেছে। সচরাচর এমনটি ঘটে না। একটি বাড়লে আরেকটি থমকে থাকে বা খুব ধীরে বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ যেন ব্যতিক্রমী এক দেশ। এখানে সব খাত একযোগে বাড়ছে।

যে-কোনো বিচারেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলো আশপাশের দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই আকর্ষণীয়। সে কারণে বাংলাদেশকে যখন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন মনে হয় আমরা আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক অর্জনের প্রতি সুবিচার করছি না। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল তিনটি কারণে যে-কোনো দেশকে স্বল্পোন্নত বলে থাকে। এই তিনটি সূচক হচ্ছে আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ('ভালনারেবিলিটি')। মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ বাদে বাকি দুটি সূচকের পরিমাপ করা হয় একাধিক উপসূচক মিলিয়ে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ, রপ্তানি আয়ের প্রবণতা হিসেবে নিলে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার বদলে স্থিতিশীলতাই বেশি করে বোঝায়। আর মানবসম্পদ উন্নয়নেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে প্রচুর সাফল্য দেখিয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের প্রবাহ বাড়িয়েছে। একেবারে তৃণমূলের মানুষকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ সরকার ও সামাজিক উদ্যোক্তারা গ্রহণ করেছে সেসবের সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। সাক্ষরতার হার, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ব্যাপকভাবে কমে এসেছে। হালে দক্ষতা বৃদ্ধির

দিকেও নজর দিচ্ছে সরকার। তাই বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ বলে বিবেচনা করার কোনো কারণ নেই। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশকে আধা-কোটিরও অনেক কম মানুষের দেশ ভুটান, কঙ্গো, জাম্বিয়ার সঙ্গে দলভুক্ত করা আসলেই অযৌক্তিক। একইভাবে কেনিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তানের মতো নিম্নপর্যায়ের মানবসম্পদের দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ওপরে। অথচ এগুলো স্বল্পোন্নত দেশ নয়। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর মাইকেল পোর্টারের সামাজিক অগ্রগতি সূচকেও বাংলাদেশ ভারত, কেনিয়া, ক্যামেরুন, পাকিস্তানের চেয়ে ঢের এগিয়ে। এমনকি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বিশ্ব প্রতিযোগিতা সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান স্বল্পোন্নত নয় এ রকম অনেক দেশ (যেমন ঘানা, ক্যামেরুন, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, জিম্বাবুইয়ে) থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

সে কারণে আমরা আর স্বল্পোন্নত দেশের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাই না। এরই মধ্যে আমরা বিশ্বব্যাংকের নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া। এই সাফল্যও আমরা অর্জন করার সামর্থ্য রাখি বলে প্রতীয়মান। তবে সে জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশেরও বেশি ও বিনিয়োগের হার জিডিপির ৩৪ শতাংশ করতে হবে। পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নের গতি আরো বাড়াতে হবে। আরো শক্ত করতে হবে রাজস্ব আহরণ, বাণিজ্যের বহুমুখীকরণ, আর্থিক খাত, ভূমিবাজার, ব্যবসা করার খরচ, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়ণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক করতে পারলে বাংলাদেশের উন্নয়ন আরো গুণমানের হবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, সুশাসন ও নাগরিকদের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক আচরণের যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে এসব মোকাবিলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। শাসনব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করাও এ সময়ের এক বড় চ্যালেঞ্জ। তবে উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু এসবের বাস্তবায়নের গতি আরো বাড়াতে হবে। এ সবই সম্ভব যদি আমরা সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে কাজ করতে পারি। তাদের সৃজনশীলতাকে যদি উৎসাহিত করে যেতে পারি, তাহলে কাঙ্ক্ষিত মানের সংস্কার ও আধুনিকায়ন নিঃসন্দেহে সম্ভব। তবে প্রশাসনের সর্বস্তরে পরিবর্তনের পক্ষে নেতৃত্ব তৈরি করা খুবই জরুরি।

বিগত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশের ম্যাক্রো অর্থনীতির রূপান্তর, এককথায় বিস্ময়কর। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনের পর্দা স্তরে স্তরে উন্মোচিত হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি খাত (শিল্প, সেবা ও কৃষি) একই লয়ে পাশাপাশি বেড়ে চলেছে। সচরাচর এমনটি ঘটে না। একটি বাড়লে আরেকটি থমকে থাকে বা খুব ধীরে বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ যেন ব্যতিক্রমী এক দেশ। এখানে সব খাত একযোগে বাড়ছে। আরো অবাক বিষয় হলো, গণতান্ত্রিক পরিবেশে কম খরচের শিল্পায়নের উড্ডয়নে (টেক-অফ) এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে বাংলাদেশ। আর এমন একসময়ে এই উড্ডয়ন ঘটছে, যখন সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার খুবই দুর্বল। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, এটি যেন এক লুকানো গুপ্তধন। তাই নানা ঝুঁকি সত্ত্বেও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ দিন দিনই বাড়ছে।

অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব ক্ষেত্রেই দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। সরকারের বাজেটীয় উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংককেই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে ব্রতী করেছে। ফলে কৃষি ও খুদে খাতে প্রচুর অর্থায়ন ঘটেছে। এর ফলে দেশীয় চাহিদা ও বাজার যেমন বেড়েছে, তেমনি সরবরাহও বেড়েছে। দেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি বরাবরই দৃশ্যমান। মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হলেও গত এক যুগ ধরে গড়ে ৬.১৪ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন দৃঢ়তাই প্রমাণ করে। গত আটটি অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধি আরো ভালো, প্রায় ৬.৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৫ শতাংশ, সেখানে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি পৌঁছে গেছে ৭-এর ঘরে (৭.১১ শতাংশ)। এটি আমাদের জন্য সুসংবাদ।

অতি দারিদ্র্যের হার কমানোর ক্ষেত্রেও আমরা এখন বেশ এগিয়ে। এই হার প্রায় ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে ৭ শতাংশে ও ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অর্জনে মাথাপিছু আয় বাড়ানোর বিকল্প নেই। সে জন্য অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। এবং এসডিজি বাস্তবায়নের যে রোডম্যাপ আমরা তৈরি করেছি, তার আলোকে সবাইকে নিয়ে সম্মিলিত জাতীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। নিজস্ব সম্পদ আহরণে আরো মনোযোগী হতে হবে।

বাড়তি মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের বড়ো শত্রু। এর মধ্যেই এই মূল্যস্ফীতি কমানোর ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। ২০১১ সালের পর থেকে মূল্যস্ফীতির হার ধারাবাহিকভাবে কমছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি কমে নভেম্বর ২০১৬ শেষে ৫.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ ধারা এখনো ক্রম হ্রাসমান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় হয়েছিল ২২.৫ বিলিয়ন ডলার, সেখানে গত অর্থবছরে হয়েছে ৪২.৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এই আট বছরের ব্যবধানে আমদানি বেড়েছে ৯১ শতাংশ। রপ্তানি ১১৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৪.২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স ৫৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চার গুণের বেশি বেড়ে এখন ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে দেশের ৯ মাসের মতো আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও জোরালো অবস্থানে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবমতে, ডলার-টাকার গড় বিনিময় হার এখন ৭৮.৭২ টাকা। এই বিনিময় হার কয়েক বছর ধরে এর আশপাশেই রয়েছে। আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪৬৬ ডলার। আগের বছর ছিল এক হাজার ৩১৬ ডলার। আর ১৯৭২ সালে তা ছিল ১০০ ডলারের

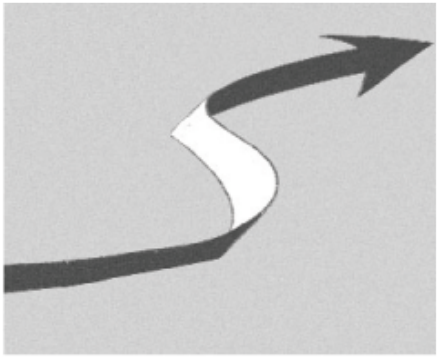

মতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এরই মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। তার মানে মাথাপিছু আয় বাড়ার হার ভবিষ্যতে আরো বেশি হবে। অর্থনীতির এসব অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধির চালক কৃষি, রেমিট্যান্স ও তৈরি পোশাকশিল্পের সমান্তরাল প্রসারের কারণে। একই সঙ্গে ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ জানাতেই হবে। তাদের অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যক্তি খাতের নেতৃত্বে রপ্তানিমুখী শিল্পনির্ভর দ্রুত অগ্রসরমাণ এক অর্থনীতির নাম বাংলাদেশ। এ দেশের প্রবৃদ্ধি সহায়ক উপাদানগুলোর প্রধান খাত হচ্ছে রপ্তানি আয়, যার ৮১ শতাংশই আসে শ্রমঘন গার্মেন্ট খাত থেকে। গার্মেন্ট খাত দ্রুত উন্নতি করছে। রানা প্লাজা ও তাজরীন ট্র্যাজেডির পর গার্মেন্ট খাত আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসা খাত অনেক উন্নতি করেছে। বেসরকারি খাতে অনেক ফার্মাসিউটিক্যালস ও হাসপাতাল হয়েছে। এ দেশের ওষুধ এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৭০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় এপিআই পার্ক চালু হলে এ সংখ্যা আরো বাড়বে বলেই বিশ্বাস। এ শিল্পের শাখা এখন বিদেশেও স্থাপন করতে শুরু করেছে উদ্যোক্তারা। চামড়া খাতে রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ খাতে আমাদের অগ্রগতি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' জনগণের মৌলিক চাওয়াকে ঘিরেই তৈরি করা হয়েছে। ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য, উদারীকরণ ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি সংস্কার, বড় বড় অবকাঠামো গড়ার উদ্যোগ, দেশব্যাপী ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার ও মার্কেটের সঙ্গে অধিক হারে সংযুক্তির কৌশলের ওপর ভিত্তি করে এই দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মতো প্রমাণিত কৌশলগুলোকে প্রয়োগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অর্থনীতি ও সৃজনশীলতা একসঙ্গে দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রবাসী ও এর বাইরেও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

এ জন্য সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও এর আওতায় বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করছে। সরকারের এসব অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি, খুদে, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর কৌশল ও নিম্ন আয়ের মানুষদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রবৃদ্ধির নতুন ধাপে আমরা মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেতে চাই। তাই বিগত সময়ের শিক্ষাকে মাথায় রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্নটি জাতিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন তার মূলে রয়েছে সাম্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও অর্থনীতি। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মূলত কৃষিনির্ভর একটি ক্ষুদ্র টানাপড়েনের অর্থনীতি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। মাত্র ৪৫ বছরে আমাদের শহরের মানুষ বেড়েছে ১০ গুণ। নগরায়ণ যেভাবে বাড়ছে তাতে এই উচ্চহারে প্রচুর টেনশন হওয়ার কথা। হচ্ছেও। গণতান্ত্রিক পরিবেশেই শুধু এসব টেনশন মোকাবিলা করা সম্ভব। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এই টেনশন মোকাবিলায় যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, সামাজিক সংগঠনগুলো প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও বহু মতামতভিত্তিক সমাজ গঠনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। অর্থায়নকে অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রে এ সবকিছুই ইতিবাচক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে আজ ২০টির মতো ব্যাংক সরাসরি অথবা তাদের সাবসিডিয়ারির মাধ্যমে মোবাইল আর্থিকসেবা দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সাড়ে তিন কোটি মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। দেড় কোটির মতো হিসাব খুবই সচল। মাসে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা এর মাধ্যমে লেনদেন হচ্ছে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশই এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্থিকসেবা দেওয়ার দাবিদার। আমাদের এই কর্মসূচিটিকে এখন ভারতসহ অনেক দেশ অনুসরণ করছে। তবে এর ঝুঁকি বিষয়েও অনেকেই নজর রাখছেন। খেয়াল রাখতে হবে এজেন্টদের অনাকাঙ্ক্ষিত ভূমিকার দায় যেন গ্রাহকদের ঘাড়ে না পড়ে। বরং কী করে গ্রাহকদের, বিশেষ করে খুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের লেনদেনের এই ব্যবস্থাটিকে আরো ঝুঁকিমুক্তভাবে সহজে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া যায় সেদিকে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সব মিলে আমাদের সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে বাড়ন্ত এই অর্থনীতির হিসসা যেন সবার ভাগ্যেই জোটে। কতিপয়তন্ত্রের শিকড় যাতে শক্তিশালী না হয়, সেদিকটা সর্বক্ষণ নজরে রাখতে হবে। তবেই না আমাদের অর্থনীতির এই গতিময়তার সুফল সব পর্যায়ের দেশবাসী ভোগ করতে পারবে।

ড. আতিউর রহমান
উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও
অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক
২৩ জানুয়ারি ২০১৭

wd‡i †`Lv 2017
AvšÍR©vwZK A½‡bi NUbvc(

নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, আলোচনা-সমালোচনার বছর ছিল ২০১৭। যুদ্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিনোদন সব ক্ষেত্রেই নানাভাবে আলোচিত ছিল বিদায়ী বছরটি। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এ বছরটিও রাজনৈতিক ঘটনাবহুল। ২০১৭ সাল নিয়ে 'ফিরে দেখা ২০১৭: আন্তর্জাতিক অঙ্গন'।

ঘটনাবহুল মধ্যপ্রাচ্য : ২০১৭ সালে পুরোটা সময়জুড়েই যথারীতি টানটান উত্তেজনায় মধ্যপ্রাচ্য। জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ট্রাম্পের স্বীকৃতিতে জন্ম দিয়েছে নতুন সঙ্কট। এছাড়া, আইএস-বিরোধী লড়াই, সৌদি-ইরান দ্বন্দ্ব, কাতার সঙ্কট, কুর্দিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বেশ কিছু ঘটনা মরুর বুকে উত্তাপ ছড়িয়েছে।

জেরুসালেম ইস্যুতে ইসরাইল-ফিলিস্তিন উত্তেজনা : বছরের শেষপ্রান্তে জেরুসালেমকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। বেলফোর ঘোষণার শতবর্ষ পূর্তির বছরই, জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুসালেমে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

এরপরই মুসলিম বিশ্বসহ পৃথিবীজুড়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এমনকি আমেরিকানরাও ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বিরোধিতা জানায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বাকি সদস্যরাষ্ট্রগুলো। এমনকি ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পূর্ব জেরুসালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানীর স্বীকৃতি দেয় ওআইসি। এর প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে ইসরাইলও সরে আসে ইউনেস্কো থেকে।

অবশেষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ভোটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে।

কাতার সঙ্কট : সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ও ইরানের সঙ্গে মিত্রতা বাড়ানোর অভিযোগে ৫ জুন কাতারের উপর সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিশর বাণিজ্য ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যদিও বরাবরই সেসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাতার। এতে অনেকটাই বিপাকে পড়ে কাতার। নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সৌদি আরব যেসব শর্ত দেয়, এর মধ্যে রয়েছে সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরা বন্ধ করে দেয়া। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এটি একটি সুদূরপ্রসারী ঘটনা। সৌদির নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে কাতারের পাশে দাঁড়ায় ইরান ও তুরস্ক।

সৌদি প্রশাসন ও রাজনীতি : এ বছর সৌদি আরবের রাজপরিবারের ক্ষমতার ধারা, প্রশাসন আর রাজনৈতিক অবস্থানে ঘটেছে চোখে পড়ার মতো সব পরিবর্তন। নারীদের গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা, স্টেডিয়ামে খেলা দেখার অনুমতি, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অবশেষে সিনেমা হল চালুর সিদ্ধান্ত ছিল আলোচিত।

সৌদি আরবকে সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণার পাশাপাশি বহুযুগের কট্টরপন্থি ওয়াহাবি ইসলাম থেকে সরে 'মধ্যপন্থি ইসলাম' গ্রহণের ঘোষণা দেন যুবরাজ। অন্যদিকে যুবরাজকে প্রধান করে দুর্নীতি দমন কমিটি গঠনের কয়েক ঘণ্টার মাথায় ১১ প্রিন্স ও ৪ মন্ত্রীসহ কয়েক ডজন সাবেক মন্ত্রী-ব্যবসায়ীকে আচমকা গ্রেপ্তার, পরদিন ইয়েমেন সীমান্তের কাছে অনুসন্ধান কাজ শেষে ফেরার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় দলবলসহ এক প্রিন্স নিহত, তার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই গ্রেপ্তার অভিযানে আরেক প্রিন্সের মৃত্যু, শেষে পাঁচতারকা হোটেলে মেঝেতে ঘুমানোর শাস্তি দিয়ে শত বিলিয়ন ডলার জরিমানায় আটক প্রিন্সদের মুক্তিদান এমন অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটতে দেখল বিশ্ব।

ইয়েমেন ও লেবানন সঙ্কট : ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথিদের বিরুদ্ধে ২ বছরের সৌদি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছর রিয়াদে কয়েক দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় হুথিরা। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে হত্যা করা হয়, ইয়েমেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালেহকে। নভেম্বরে লেবাননের শিয়াগোষ্ঠী হেজবুল্লাহকে ঘিরে দেশটিকে নিয়ে শুরু হয় নতুন মেরুকরণ। অভিযোগ ওঠে, সৌদি আরবের চাপেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন, লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী সাদ আল হারিরি। শেষমেষ ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারও করেন তিনি।

কুর্দি স্বাধীনতার গণভোট : স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ইরাকে। সেপ্টেম্বরের গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিলেও, শেষমেষ কিরকুকসহ কুর্দি অধ্যুষিত অনেক এলাকাই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

রাখাইনে মিয়ানমারের সেনা অভিযান : ২৫ আগস্ট থেকে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযান শুরু করে। এ সময় কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়। রোহিঙ্গাদের সহস্রাধিক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন প্রায় সাড়ে ৬ লাখ রোহিঙ্গা। কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদের ঠাঁই হয়েছে।

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা তাদের ওপর চালানো হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। পালিয়ে আসাদের অনেকেই ছিলেন গুলিবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোহিঙ্গাদের ওপর যখন এ ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছিল, তখন মায়ানমারের শান্তিতে নোবেল বিজয়ী নেত্রী অং সান সুচি নীরবতা পালন করেছেন। পরে তিনি বলেন, ঠিক কী কারণে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে যাচ্ছেন, তা তিনি জানতে চান। সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করা থেকেও বিরত থাকেন তিনি। রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের জেরে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে মায়ানমার। দেশটির সেনাসদস্যদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র।

হায়াইট হাউসে ট্রাম্প যুগ : বছরজুড়েই আলোচনায় ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্যাসিনো ব্যবসায়ী থেকে নাম লেখান যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে। সবাইকে চমকে দিয়ে গত ১৭ থেকে ২১ জানুয়ারি তিনি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'উই উইল মেইক আমেরিকা স্ট্রং এগেইন' স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এলেও অভিবাসী, মুসলমান ও নারী বিদ্বেষী নানান বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড করা ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরজুড়েই সমালোচনায় ছিলেন। সাত মুসলিম দেশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরের শেষে এসে জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী স্বীকৃতি দিয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সমালোচনার ঝড় তুলেছেন।

ছয় মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা : অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বিশেষ করে মুসলিম অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রতি কঠোর হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় এসেই তিনি ছয় মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন-বিক্ষোভ হলেও শেষ পর্যন্ত ৪ ডিসেম্বর দেশটির সুপ্রিমকোর্ট তা অনুমোদন করেন। এতে চাদ, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার হারান।

কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার জন্য গণভোট : স্পেনের আংশিক-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কাতালোনিয়া অক্টোবরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেও যথেষ্ট সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। বরং আগে থাকা স্বায়ত্তশাসনটাও হারিয়ে বসে অঞ্চলটি। স্পেন সরকার একদিকে আঞ্চলিক সংসদ বিলুপ্ত করে কাতালোনিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কাতালান প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুজদেমনসহ বহিষ্কৃত নেতারা পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে। পরে অবশ্য তারা ফিরে আত্মসমর্পণ করেন।

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে মুগাবের পদত্যাগ : নভেম্বরের মাঝামাঝিতে জিম্বাবুয়ের রাজপথ দখলে নিয়ে ৯৩ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবেকে সপরিবারে গৃহবন্দী করে সেনাবাহিনী। গৃহবন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনী ও নিজ দলের চাপে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে রাজি হলেও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ডিসেম্বরের আগে পদ ছাড়বেন না তিনি।

ক্ষমতাসীন দল প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অভিসংশনের হুমকি দিলে মুগাবে অনেকটা হঠাৎ করেই ২১ নভেম্বর ৩৭ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে পদত্যাগ করেন। মুগাবের জায়গায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তার হাতেই বরখাস্ত সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এমারসন নাঙ্গাগওয়া। মুগাবের ক্ষমতাচ্যুতি চেষ্টায় তেমন কোনো রক্তপাত না ঘটায় একে ইতিবাচক হিসেবে দেখে আশেকা বলেন, নতুন সরকারের কাজকর্ম জনগণের বুঝে উঠতেই আগামী বছরের অনেকটা কেটে যেতে পারে। তবে প্রথমদিক হিসেবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের কিছু আশা রয়েছে।

নওয়াজ শরিফের পদত্যাগ : ২৮ জুলাই আদালতের রায়ে 'অযোগ্য'

ঘোষিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ান পাকিস্তান মুসলিম লিগের প্রধান নওয়াজ শরিফ। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের পর পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে অযোগ্য ঘোষণা করেন। পানামা পেপারস মামলায় ওই রায়ের ১ ঘণ্টা পর পদত্যাগের এ ঘোষণা দেন তিনি। তবে নওয়াজ ও তার পরিবার দুর্নীতির এসব অভিযোগ অস্বীকার করে। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রীই পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। নওয়াজ শরিফের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

প্যারাডাইজ পেপারস কেলেঙ্কারি : পানামা পেপারসের রেশ শেষ না হতেই, বারমুডাভিত্তিক ল ফার্ম প্রতিষ্ঠান অ্যাপলবির ১ কোটি ৩৪ লাখ গোপন নথিতে ফাঁস হয় বিভিন্ন দেশের বহু প্রভাবশালীর গোপন সম্পদের খবর। 'প্যারাডাইস পেপারস' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এসব নথিতে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ, প্রিন্স চার্লস, মার্কিন মন্ত্রী উইলবার রসসহ অনেকের নামই এসেছে। অ্যাপল, নাইকি ও উবারসহ প্রায় ১০০ বহুজাতিক কোম্পানির কর পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রকাশ পেয়েছে এসব নথিতে। কানাডার লিবারেল পার্টির প্রধান এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান ও অন্যতম অর্থদাতা লর্ড অ্যাশক্রফটের অফশোর বিনিয়োগের তথ্যও ফাঁস হয়েছে।

রোবট নাগরিক সোফিয়া : ২৫ অক্টোবর ২০১৭ সৌদি আরব 'সোফিয়া' নামের একটি রোবটকে পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করে। রোবটকে নাগরিকত্ব প্রদানের ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। রোবট হলেও সোফিয়া মুখে ৬২ ধরনের অভিব্যক্তি ফোটাতে পারে। সোফিয়াকে তৈরি করেছে হংকংয়ের কোম্পানি হ্যানসন রোবটিকস। প্রকৌশলী ও ডিজাইনারদের নেতৃত্বে ছিলেন ড. ডেভিড হ্যানসন। ৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ মেলায় সোফিয়াকে আনা হয়।

বরখাস্ত ইংলাক সিনাওয়াত্রা : থাইল্যান্ডের প্রথম নির্বাচিত নারী প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রা। ৭ মে ২০১৪ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাংবিধানিক আদালত তাকে বরখাস্ত করে। ২০১৫ সালে জান্তা সমর্থিত সরকার ইংলাককে ইমপিচ করার পাশাপাশি পাঁচ বছরের জন্য রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করে। এ ছাড়া ২০১৭ সালে কেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছেন ভারতের বিতর্কিত ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিম সিংহ। দুই শিষ্যকে ধর্ষণের অপরাধে তাকে দুই মামলায় ১০ বছর করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত।

ব্রেক্সিট বিল : যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ২৩ জুন ২০১৬ সালে। ১ মার্চ ২০১৭ ও ৭ মার্চ ২০১৭ হাউস অব লর্ডসের অনির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা দুই দফায় ওই বিলে সংশোধনীর পক্ষে ভোট দেন। এমন পরিস্থিতিতে ব্রেক্সিট আলোচনা শুরুর ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মের পরিকল্পনা হুমকির সম্মুখীন হয়। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকার সংশোধনী ছাড়াই ১৩ মার্চ ২০১৭ ব্রেক্সিট বিল পার্লামেন্টে চূড়ান্তভাবে পাস হয়।

দেশে দেশে জঙ্গি হামলা : ২০১৭ সালের প্রথম প্রহরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে একটি নাইট ক্লাবে এক বন্দুকধারী বিদেশি আইএস জঙ্গি

পর্যটকসহ ৩৯ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে একটি মাজারে আত্মঘাতী হামলায় ৮০ জন নিহত হন। মে মাসে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে আরিয়ানা গ্রান্ডের কনসার্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হয় ২২ জন। আগস্টে স্পেনের পর্যটন নগরী বার্সেলোনায় মানুষের ভিড়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করা হয়। অক্টোবরে সোমালিয়ার মোগাদিসুতে ট্রাকবোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৫০০। পরের মাসে মিসরের সিনাই উপত্যকায় মসজিদে বন্দুকধারীদের হামলায় তিন শতাধিক মুসল্লির মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

হাতে লেখা বৃহত্তম কুরআন : মিসরের রাজধানী কায়রোর উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী শিল্পী সাদ মোহাম্মদ পবিত্র কোরআনের হাতে লেখা সবচেয়ে বড়ো সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে ৭০০ মিটার বা ২,২৯৬ ফুট দৈর্ঘ্যের কাগজের বান্ডেলে এ কোরআনের আয়াতসমূহ লেখেন। এর আগে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সবচেয়ে বড় ছাপানো কোরআনের রেকর্ড থাকলেও হাতে লেখা কিংবা আঁকা কোরআনের কোনো বিশ্বরেকর্ড ছিল না।

প্রথম কৃত্রিম ভ্রূণ তৈরি : ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো ইঁদুরের ভ্রূণ তৈরিতে সফল হন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এ ভ্রূণটি তৈরি করেন। জীবন্ত এ ভ্রূণটি তৈরি হতে সময় লাগে মাত্র চার দিন। এ ছাড়া এ বছরই বিশ্বের প্রথম প্রিডি মানব টিস্যু বানানোর প্রিটার বানাতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিভিত্তিক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্স সলিউশন।

অংকুর

ওরা কারা

মুন্না মন্ডল
সদস্য নং ১২৫৮/২০১৬

ভোর হলো, উঠে গেল।
কথা নেই কাজ করো।
সূর্য উঠা থেকে, ডোবা পর্যন্ত;
মাটির সাথে লড়াই করো।
কোমড়ে গামছা, গাত্র খালি,
চলরে তোরা তাড়াতাড়ি।
ভগ্ন কণ্ঠ, পূর্ণ জোর,
পরিশ্রমে তারা নিত্য অসুর।
ঘাম ঝরে, থামে নারে।
কাটে ঢেলা, নিয়ে মেলা
গড়ে তুলে সেই পর্বতমালা।
কাঁধে কোদাল, মাথায় ডালি,
রয় কি পরিচয় আরো বাকি?
ওরা তো সেই মাটি কাটার দল।

প্রত্যাবর্তন

জাহিদ হাসান নুর
সদস্য নং ৯৫৮/২০১১

আমি আসব
অন্ধকারে নয়তো কিঞ্চিৎ জোসনায়
হয়তো বা দিনে দুপুরে নয়তো অবেলায়।

আমি আসব
কৃষাণীর হাত ধরে নয়তো সমতায়
রুগ্ন-রুক্ষতায় অপরিমেয় ভালোবাসায়।

আমি আসব
প্রেয়সীর চুলের খোপায় নয়তো কাজল রেখায়
কখনো-বা বৃষ্টি হয়ে চোখের কোনায়।

আমি আসব
গাছের কচি ডগায় নয়তো ঝরা পাতায় শুকনো বোটায়
তারুণ্যের দীপ্ততায় নয়তো অলসতায়।

জীবন কেতন

শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী
সদস্য নং ২১/১৯৮৫

জীবন যখন গেছেই ক্ষয়ে,
পথিক আমি পথেই নামি।
ঠিকানাটা খুঁজতে গিয়ে
প্রশ্ন করি মনে মনে,
কি আর হবে বেঁচে?
প্রেতাত্মারা হামা দিয়ে
আমার কানে
আস্তে এসে
বলছে
হেসে
'কি?'
মৃত্যু
যখন
কাছে এসে
বসবে পাশে,
অমনি তখন
জীবন তুমি মোরে
বলবে আমি আছি বলে,
পাখির মতো পাখা মেলে,
বিপদ বাধা আসলে পরে,
পথ খুঁজে নেই নতুন করে,
জীর্ণ জরা ছিন্ন করে স্বপ্ন দেখি
হরিণেরই ডাগর ডাগর চোখে।
আবার যদি মৃত্যু তোমায় পড়ে মনে,
ভালোবাসার আশা দিয়ে সুর বেঁধে নেই।
সকল বাধার দেয়াল ভেঙে বিজয় গানে,
নতুন করে বাঁচার আশায় কেতন ওড়াই।

[পুরাতন সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

নৌকা ভ্রমণ

মো. আনজারুল ইসলাম
সদস্য নং ৯৫৪/২০১১

ভ্রমণ সবসময়ই আনন্দদায়ক, তবে ভ্রমণ শুধু আনন্দই দেয় না, বরং ভ্রমণের মাধ্যমে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র সব তথ্য জানা যায়। মানব মন একইসঙ্গে আনন্দ ও জ্ঞানপিপাসু। পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুস্কর যে ভ্রমণে যাওয়া পছন্দ করে না। সে ক্ষেত্রে নানারকম ভ্রমণের মধ্যে বিশেষভাবে আনন্দদায়ক হলো নৌকা ভ্রবণ। কেন না নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ খুব সহজেই প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পারে।

সাধারণত স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে ভ্রমণ করা যায়। নদীমার্তৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের বিস্তীর্ণ মাটির বুকে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল। এই দেশের মানুষ একসময় নৌপথেই বেশি যাতায়াত করত। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমানে নৌ-পথ তত বেশি ব্যবহৃত না হলেও গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকাতেই ভ্রমণ করতে হয়। এমনি এক ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল আমারও।

এইচএসসি পরীক্ষা শেষে আমি তখন মুক্ত। পড়ালেখার তেমন কোনো চাপ না থাকায় বন্ধুরা মিলে পরিকল্পনা কোথাও বেড়াতে যাবার। কিন্তু কোনো পরিকল্পনাতেই সবাই একমত হতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু বলে উঠল নৌকা ভ্রমণের কথা। যেহেতু আমাদের বাড়ির আশেপাশে বড়ো কোনো নদী নেই তাই নৌকাও নেই। নৌকা ভ্রমণের স্বপ্নটা ছিল অনেকদিনের। তাই নৌকা ভ্রমণের কথাটা শুনে আমরা সবাই একমত হলাম। শুক্রবার আমরা সবাই নৌকা ভ্রমণে যাব ঘাঘট নদীতে।

যাত্রার আগের দিন একটি মাঝারি আকারের নৌকা ভাড়া করা হলো। যাত্রাপথে সাথে নিলাম ক্যামেরা, স্মার্ট মোবাইল ফোন, সেলফি স্টিক, পানি এবং কিছু শুকনো খাবার, আইসক্রিম, চানাচুর, চিপস, কলা ইত্যাদি। একটা বড়ো ফ্ল্যাক্সে চাও সাথে নেওয়া হলো।

সকালে আমরা রওনা করে ঘাঘট ঘাটে এসে পৌছালাম। কিন্তু সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মেও প্রখর রোদ ছিল কিন্তু কোনো কিছুই যেন আমাদের হার মানাতে পারছিল না। আমরা সবাই অনেক আনন্দের সাথে নৌকায় উঠলাম এবং যাত্রা শুরু করলাম। মাঝি যখন নোঙ্গর তুলে যাত্রা শুরু করল তখন আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। নৌকা ছাড়ার পর নৌকা যখন পানির উপর দিয়ে বয়ে চলছিল, তখন আমি নদীর পানি স্পর্শ করে প্রকৃতির স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। খুব মন চাচ্ছিল যে এই মুহূর্তে যদি একটা গান শোনা যেত খুব ভালো হতো। ঠিক তখনি মাঝি গান ধরল 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না'।

নৌকায় উঠার প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল আমার এটা তাই একটু ভয়ও লাগছিল। কিন্তু মাঝির মনমুগ্ধ গানের সুরে আমি যেন হারিয়ে গেলাম নদীর অতল তলে আর আমার হৃদয় যেন বিস্তৃত হলো ঐ নদীর মতোই। বৈঠা ও পানির মিলিত ছন্দ আর সেই সাথে মাঝির গাওয়া গান আমাদের মনে এক অর্ভূতপূর্ব দোলা দিতে লাগল। আমি নৌকার গলুইয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে মাঝির গান শুনছিলাম। নৌকা চলছিল তার নিজস্ব গতিতে, অনুভূতিগুলো এত ভালো কাজ করছিল যে নৌকা কখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে টেরই পেলাম না। নদীতে মাছ ধরা অন্য মাঝিরা গান ধরেছে ভাটির গান–'আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি/ তুমি এই ঘাটে লাগায়ারে নাও/
নিগুম কথা কইয়া যাও শুনি'

নদীতে আরও অনেক নৌকা চলছিল। কোনটি যাত্রীবাহী আবার কোনটি মালবাহী। ছোটো, বড়ো, মাঝারী কত বড়ো আকারের নৌকা। মাঝি আমাদের অনেক নৌকার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ডিঙি সাম্পান, পানসি, ময়ূরপঙ্খী আরো কত নাম। কিছু কিছু নৌকা আবার ইঞ্জিনে চলে।

মাঝনদীতে এসে অনুভব করলাম সৃষ্টিকর্তা কত অপরূপ করে আমাদের এই দেশকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নদীর দুধারের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। নদীর দুধারে ফসলের খেত, খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে দু একটা ঘর। হঠাৎ দেখলাম এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে যাচ্ছে। মনটাকে তখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনে হলো। কোনো কোনো নৌকা হতে মাছ ধরা হচ্ছে। জালের মধ্যে আটকে থাকা মাছের রূপালি শরীর রোদ পড়ে চিকচিক করছে। এই নদী থেকে যে শুধু মাছ ধরা হয় তা নয় এই নদীতে হইচই করে সাঁতার কাটছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বধূরা এসেছে নদীর পানি নিতে। নৌকার মাঝ থেকে দূরের গ্রামকে মনে হচ্ছে শিল্পীর নিপুণ হাতের চিত্রকর্ম। চারদিকে শান্ত, নিশ্চুপ–কেবল পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমরা যেন কথা বলা ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে কথা বলতে গেলেই অপরূপ সুন্দর এই প্রকৃতির কোনো একটি দৃশ্য হারিয়ে যাবে। এরই ফাঁকে ফাঁকে কিছু দৃশ্য আমরা ক্যামেরা বন্দি করলাম।

মাঝি যখন একটা ঘাটে নৌকা থামাল তখন দুপুর। যেখানে নৌকা ভিড়াল সেখানে একটা হাট বসেছে। বাজারে অনেক ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। আমি বাজারের কাচের চুরির দোকান হতে দুই ঝুরি লাল টুকটুকে চুরি কিনলাম আমরা বাজারের দোকান থেকে আমাদের সবার পছন্দের ফুসকা, চটপটি, চানাচুর সবকিছু খুব মজা করে খেলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে আমরা নৌকায় ফিরে আসলাম।

আমরা যখন নৌকায় ফিরলাম তখন দেখি একজন মাঝি নৌকাতেই বানানো চুলায় ভাত রান্না করছে। আর একজন মাঝি মাছ কুটছে। রান্না হয়ে গেলে আমরা সবাই একসাথে খেতে বসলাম। নৌকায় বসে গরম ভাত আর নদীর টাটকা মাছ খেতে যেন অমৃতের মতো লাগছে। খুব মজা করে খাবারটা শেষ করলাম। রোদ একটু পড়ে আসলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

গ্রীষ্মের রোদ আমাদের উপর দিয়েই চলে গেল কিন্তু আমরা যেন কেউ টেরই পেলাম না। বিকেল হয়ে যাওয়ায় হালকা হালকা বাতাস বইছিল তখনকার অনুভূতিগুলো আরও অনেক গাঢ় হচ্ছিল। কিছু কিছু কথা ভাবতে মন চাচ্ছিল এইরকম আবহাওয়ায়। যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল ততোই নদীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পাখিরা কলকলিতে মেতে উঠল। সূর্যটা যেন দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে হেলে পড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশ সূর্যের রক্তিম আভায় লাল হয়ে উঠলো। আমার জীবনে এই প্রথম আমি নদীতে সূর্য অস্ত যাবার দৃশ্যটি দেখলাম, যা আমার স্মৃতিতে চির অমলিন হয়ে থাকবে। আমার অভিজ্ঞতা সবসময়ই আনন্দের। নদীমার্তৃক বাংলাদেশে নৌকা ভ্রমণ বিচিত্র কিছু না হলেও এ ভ্রমণ আমাদের সবার মনেই চির অম্লান হয়ে আছে।

স্বপ্ন সারথীর বিদায়

আনিসুল হকের জন্ম ১৯৫২ সালের ২৭ অক্টোবর, নোয়াখালীতে। শৈশবের বেশ কিছু সময় কেটেছে ফেনীর সোনাপুর গ্রামে, নানাবাড়িতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আনিসুল হক খ্যাতি অর্জন করেন টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে বিটিভিতে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মুখোমুখি একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। ১৯৮৬ সাল থেকে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মোহাম্মদী গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলেন সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উত্তাল দিনগুলোতে। এ ছাড়া, তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ, সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এ ছাড়া বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্টস পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের এপ্রিলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে।

২০১৫ সালের ৬ মে ডিএনসিসির মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় এক কোটি মানুষের নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। সেই থেকে নিরন্তর নগরবাসীর স্বপ্ন পূরণে ছুটেছেন তিনি। মেয়াদের অর্ধেক পেরোনোর আগেই সফলতা দেখিয়েছেন, প্রশংসাও কুড়িয়েছেন অনেক। মেয়র হওয়ার আগেই 'আমরা ঢাকা' নামে স্লোগান তুলে আনিসুল হক নগরবাসীকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। কোথাও কোনো সেবার প্রয়োজন হলে ছবি তুলে মেয়রকে জানানো যেত। দু-এক দিনের মধ্যেই প্রতিকার মিলত। ঢাকার রাস্তায় অভিজাত যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, রাস্তা থেকে ময়লা অপসারণ, চলাচলের উপযোগী ফুটপাত নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারসহ নানা কর্মকাণ্ডে মাত্র দেড় বছরেই বড় সফলতা অর্জন করেছেন আনিসুল হক।

যানজট কমাতে কঠোর ভূমিকা পালন করেন। মোহাম্মদপুর, মিরপুর-১২, ভেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, কারওয়ান বাজারের বিভিন্ন রাস্তা, মহাখালী বাসস্ট্যান্ড, পাবতলী, কল্যাণপুরসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করেছেন। নগরের যানজট কমাতে ইউলুপ নির্মাণের কাজও শুরু করেন। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম এক বছরের মধ্যেই ১১৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছেন, ৪৫১টি রাস্তা উন্নয়নের কাজ করেছেন, ১৪৮ কিলোমিটার ড্রেনে সংস্কার এনেছেন। ৬৮ কিলোমিটার ফুটপাতের উন্নয়নও করেছেন প্রথম এক বছরেই।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু ডিএনসিসিতে এ ধরনের দুর্নীতি রোধ করতে পেরেছিলেন আনিসুল হক। মেয়াদের এক বছর পূর্তিতে কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকেই স্বচ্ছতার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছি। আমি সবাইকে বলেছি, আমরা হয়তো শতভাগ স্বচ্ছ হতে পারব না, তবে যতটুকু সম্ভব তা নিশ্চিত করে যাচ্ছি। প্রথম থেকেই ই-টেন্ডারিং করা শুরু করেছি। এ নিয়ে অনেকেই বাধা-বিপত্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছে। আমি ইতিমধ্যে দাপ্তরিকভাবে ফাইল তিন দিনের বেশি না রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ ছাড়া, মাসে ২০ লাখ টাকার জ্বালানি ব্যয় কমিয়ে এনেছি।'

ঢাকার জলাবদ্ধতায় নগরবাসীর দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে একাত্মতা স্বীকার করে আনিসুল হক বলেছিলেন, সিটি করপোরেশনের পক্ষে জলাবদ্ধতা দূর করা দুরূহ। তবে ঢাকা উত্তরকে 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তোলা, যানজট কমানো, আবর্জনামুক্ত ঢাকা গড়া, পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা এমনকি প্রভাবশালী দেশগুলোর দূতাবাসের দখল থেকে গুলশানের ফুটপাত নগরবাসীর হাঁটার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস টব বসানোসহ নানাভাবে ফুটপাত দখল করে নগরবাসীকে সেখান দিয়ে হাঁটতে বাধা দিয়ে আসছিল। মেয়র আনিসুল হক বলিষ্ঠভাবে ওই সব ফুটপাতের দখল নিয়ে নগরবাসীর জন্য তা উন্মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার দেশের ফুটপাত দিয়ে আমার নাগরিকরা হাঁটতে পারবে না, এটা হতে পারে না।'

কালের কণ্ঠ ১ ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর অনন্য অর্জন

পাবনার ঈশ্বরদীর সলিমপুর ইউনিয়নের নিভৃত গ্রাম জয়নগর। কে ভাবতে পেরেছিল–এখানে জন্ম নেওয়া মাহমুদা সুলতানা মুনমুন নামে এক তরুণীই এক সময় বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরবেন জয়নগর তথা বাংলাদেশের নাম! কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জটিল গণ্ডি পেরিয়ে ন্যানো ম্যাটারিয়াল ও মহাকাশে ব্যবহারযোগ্য কোয়ান্টাম ডট স্পেক্ট্রোমিটার ডিভাইস আবিষ্কার করে এরই মধ্যে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানী মাহমুদা। তারই স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসার আইআরএডি বর্ষসেরা উদ্ভাবক নির্বাচিত হয়েছেন মাহমুদা।

একই সঙ্গে নাসার সাময়িকী 'কাটিং এজ'-এর সাম্প্রতিক ইস্যুর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনও করা হয়েছে মাহমুদাকে নিয়ে। মূলত নাসার অধীনে গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারস ইন্টারনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআরএডি) কর্মসূচির আওতায় যেসব বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন, তাদেরকে বার্ষিকভাবে এ খেতাব দেওয়া হয়। এ বছর এই কর্মসূচিতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন কাজে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে মাহমুদা এ খেতাব জিতে নিলেন।

মাহমুদাকে নিয়ে নাসা কর্মকর্তারাও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন। তারা বলছেন, এত কম বয়সী কোনো মেয়েকে এর আগে তারা নাসায় কাজ করতে দেখেননি। নাসার প্রধান কর্মকর্তা পিটার হিউজেস বলেন, মাহমুদাকে আমরা বর্ষসেরা উদ্ভাবক মনোনীত করতে পেরে গর্বিত। কারণ সে নাসার যে ক'টি কাজে অংশগ্রহণ করেছে, তার প্রত্যেকটিতেই দিয়েছে অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয়। তার চমৎকার পারদর্শিতায় আমরা আশা করছি, খুব শিগগিরই মাহমুদা নাসার একজন ন্যানো টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে।

মাহমুদার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, কিশোরী বয়সেই মাহমুদা যুক্তরাষ্ট্রে যান। তিনি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। এর পর ২০১০ সালে মাহমুদা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পিএইচডি লাভ করেন। একই বছর এক জব ফেয়ারে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে তিনি নাসায় কাজের সুযোগ পান। তার বড়ো চাচাও নাসার এমস রিসার্চ সেন্টারে ফিজিসিস্ট হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে মাহমুদা ও তার দল এমআইটির অধীনে প্রোটোটাইপ ইমেজিং স্পেক্ট্রোমিটার তৈরিতে কাজ করছেন।

সুমন মজুমদার
সেলিম সরদার
সমকাল ৩১ অক্টোবর ২০১৭

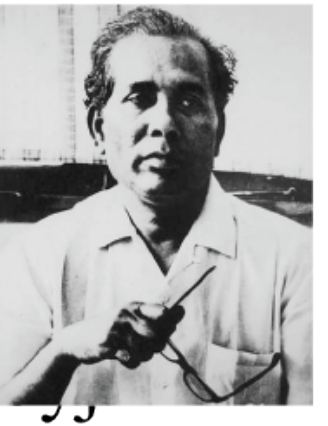

`ywf©¶ I Rq

Rqbyj 1943 mv‡ji GB `ywf©¶-wPÎgvjv A¼‡bi ga¨ w`‡q fviZe‡l© L¨vwZgvb wkíx cÖwZwôZ nb| fqven `ywf©¶ Zuvi wkíxmËv‡K cÖejfv‡e bvov †`q| wZwb `ywf© gvby‡li †eu‡P _vKvi AvwZ©‡K †gvUv Zzwj‡Z †hfv‡e i*f*cvwqZ K‡iwQ‡jb Zvi † †bB| GB wPÎgvjv GKw`‡K gvbweK wech©‡qi Avðh© `wjj n‡q Av‡Q, Ab¨w`‡ wPÎgvjv A¼‡bi ga¨ w`‡q wZwb n‡q D‡V‡Qb GKRb AvšÍR©vwZK L¨vZbvgv

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। আচার্যের বহুমুখীন সৃজন ও কর্মধারা এদেশের শিল্প-আন্দোলনকে কতভাবে যে সঞ্জীবিত করেছে এ বলে বোধকরি শেষ করা যাবে না। তাঁকে নিয়ে তর্ক, আলোচনা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সময় আমরা তাঁর সৃজনে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার অবিনাশী রেখা নিয়েই সাধারণত আলোচনা করি। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের বৈভব দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রাণিত করছেন এবং এই শিল্পী দেশের শিল্প-আন্দোলনকে যে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিকে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আচার্যের শতবার্ষিকীর আলোছায়ায় সে-প্রসঙ্গই আলোচিত হোক এবং ভবিষ্যতে কোনো গবেষক তাঁকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনী রচনা করুক–এ প্রত্যাশা করি। আশা করা যায়, গ্রন্থটি হয়ে উঠবে তাঁর সময়কাল, চেতনা এবং শিল্পকর্মধারার শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থ। যদিও সম্প্রতি ইতালি ও বাংলাদেশের যৌথ প্রয়াসে প্রকাশিত একটি ইংরেজি গ্রন্থ যথেষ্ট আদৃত হচ্ছে বিশ্ববাজারে, তবু শতবার্ষিকী উপলক্ষে আরো প্রাণদায়ী গবেষণা ও জিজ্ঞাসা-উন্মুখ গ্রন্থ প্রকাশিত হোক–এ তো প্রত্যাশা করাই যায়।

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনে জয়নুল আবেদিনের স্থান পথিকৃতের। তাঁর সৃজনশক্তি ছিল অসাধারণ। শৈল্পিক দক্ষতা ও প্রতিভার গুণে তিনি চল্লিশের দশকেই ভারতবর্ষের কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। রেখার দীপ্তি এবং মোটা ব্রাশের টান তাঁর সৃজনকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছিল।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। তিনি ১৯৪৮ সালে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সময়সীমা পর্যন্ত এদেশের চিত্রবিদ্যা চর্চা শুধু সঞ্জীবিত হয়নি, আধুনিক ও সমকালীন চিত্রকলা-আন্দোলনেও প্রাণসঞ্চার করে আসছে। আজ বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

জয়নুল আবেদিন চল্লিশের দশকেই কলকাতা আর্ট স্কুলের যখন ছাত্র তখনই চমৎকার নিসর্গচিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এই দক্ষতা ও স্বতন্ত্র চিত্রভাষা সৃষ্টির জন্যই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি যখন কলকাতা আর্ট স্কুলের নবীন শিক্ষক তখন তাঁর বড়ো কীর্তি দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার সৃষ্টি।

মনুষ্যত্বের এমন লাঞ্ছনা ও অপমান জয়নুলের হৃদয়কে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তিনি অতিসাধারণ কাগজে মনুষ্যত্বের এ-যন্ত্রণাকে শিল্পকুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেন। এই স্কেচগুলো বিভিন্ন সংবাদপত্রে,

বিশেষত পিপলস ওয়ার ও জনযুদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাঙালির বিবেক নাড়া খায়। চট্টগ্রাম থেকে শিল্পী সোমনাথ হোর ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত মেদিনীপুর ঘুরে দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারী ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের ছবি এঁকে পাঠান শিল্পী চিত্তপ্রসাদ। এই তিনজন দুর্ভিক্ষের চিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এই চিত্রগুচ্ছ সেই সময়ের মানবিক বিপর্যয়েরও এক দলিল হয়ে আছে। জয়নুল আবেদিনের ব্রাশের টান যে এত শক্তিশালী হতে পারে, এত মর্মভেদী হতে পারে, এত বছর পরও এই ছবিগুলো সে-কথাই বলে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আরো কয়েকজন ছবি আঁকেন। কিন্তু সর্বাধিক আলোচিত হন জয়নুল। মোটা ব্রাশের টানের এই চিত্রগুচ্ছ খুবই মর্মভেদী।

জয়নুল একটি একক প্রদর্শনী করেন এসব ছবি নিয়ে। শিল্পানুরাগী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিল এই ড্রইং দেখে। এতদিন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদপত্রে এ-ড্রইংগুলো প্রকাশিত হচ্ছিল। একসঙ্গে মোটা ব্রাশের টানে মানবজীবনের ট্র্যাজেডি পর্যবেক্ষণ যে-কোনো হৃদয়বান মানুষকে দুর্গতদের জন্য সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল লঙ্গরখানা। পরিপার্শ্বের এই রূপায়ণ এতই বাস্তব ও নিখুঁত যে, জয়নুলের এই ড্রইংগুলো উত্তরকালের জন্যও হয়ে উঠেছিল মানুষের মর্মবেদনার উপলব্ধিজাত অনন্য সৃষ্টি। এই ড্রইংগুচ্ছ পরবর্তীকালের চিত্রীদের মানসভুবনে ছাপ ফেলেছে। যদিও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষজনিত কারণে শীর্ণকায় মানুষের ক্ষুৎপিপাসার জন্য আর্তনাদ, ডাস্টবিনে কুকুরের যৎসামান্য উচ্ছিষ্ট খাদ্যের জন্য লড়াই প্রত্যক্ষণ এক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিনই একই দৃশ্য দেখছিলেন কলকাতাসহ বাংলার বৃহৎ শহরের নাগরিকরা।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে সাম্প্রতিক নানা গবেষণা থেকে জানা যায়, মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ রোধ করা সম্ভব ছিল। সরকারের ঔদাসীন্য, খাদ্যশস্য সরবরাহে ব্যর্থতা, যুদ্ধ, মুনাফালোভীদের খাদ্য মজুদ ও গণতন্ত্রহীনতা ছিল এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বিক্রমপুরসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গ্রামের কৃষিজীবী মানুষই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যৎসামান্য খাদ্যের আশায় ও বেঁচে থাকার আর্তি নিয়ে দলে দলে লোক পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে এসেছিল বড়ো বড়ো শহরে। কঙ্কালসার এই মানুষগুলো খেতে না পেয়ে মরে থাকত ডাস্টবিনের পাশে, ফুটপাতে ও রকে। জয়নুল আবেদিন তখন নবীন যুবা, দারিদ্র্যের এই লাঞ্ছনা তাঁকে প্রবলভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি ছবি আঁকলেন এবং এই ড্রইংগুলো প্রকাশিত হলো সংবাদপত্রে। একই সময়ে স্টেটসম্যান এবং বামপন্থী পত্রিকায় সুশীল জানার আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। জয়নুল, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোরের ড্রইং নাড়া দিলো মধ্যবিত্তের বিবেককে। এই আলোড়ন থেকেই লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। এই লঙ্গরখানা খোলার ফলে লাখ লাখ মানুষ বেঁচে গিয়েছিল।

জয়নুল ১৯৪৩ সালের এই দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের বেঁচে থাকার আর্তিকে মোটা তুলিতে যেভাবে রূপায়িত করেছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। এই চিত্রমালা একদিকে মানবিক বিপর্যয়ের আশ্চর্য দলিল হয়ে আছে, অন্যদিকে এই চিত্রমালা অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা শিল্পী।

পরবর্তীকালে উনিশশো ষাটের ও সত্তরের দশকে বাংলাদেশের যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগ, সংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। একই সঙ্গে তাঁর সৃজনও এই সময়ে নানা মাত্রিক ও অঙ্গীকারের চেতনালগ্ন হয়ে ওঠে।

বিশেষত সত্তরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের জন্য তিনি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী জাহানারা আবেদিন এক সাক্ষাৎকারে আমাদের জানান, দীর্ঘ 'মনপুরা' ছবিটি অঙ্কনের আগে কীভাবে তিনি যন্ত্রণাকাতর ছিলেন। এই যন্ত্রণাকাতরতা থেকে তাঁর অঙ্গীকার ও শিল্পীসত্তা আমাদের কাছে নবীন আলোক নিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। 'মনপুরা'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রবলভাবে স্পর্শ করেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মীয় আদর্শকে সমুন্নত করে। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে চারুকলা-চর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। প্রথাশাসিত সমাজে ছবি আঁকাকে নিরুৎসাহিত করা হতো। এসব দিক থেকে দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায়, ১৯৪৮ সালে মাত্র দুটি কক্ষ নিয়ে পুরনো ঢাকায় যখন চারুকলার স্কুলটি যাত্রা শুরু করেছিল, তখন এ ছিল সত্যিকার অর্থে এক দুরূহ কাজ। অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের দেশে এ-শিক্ষালয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েও তখন অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। কেউ ভাবেননি মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি মহীরুহ হয়ে উঠবে, অগণিত শিক্ষার্থীকে আধুনিক শিল্পশিক্ষায় দীক্ষিত করবে। প্রতিষ্ঠাকালে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র আঠারোজন। প্রথম ব্যাচের ছাত্র আমিনুল ইসলামের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, আঠারোজন ভর্তি হলেও কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র স্কুল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। জয়নুল আবেদিনের নিরলস পরিশ্রমে গড়ে ওঠা শিল্পশিক্ষার এই উন্নত প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। একইসঙ্গে এদেশে বর্তমানে আধুনিক শিল্পচর্চার যে-পরিবেশ গড়ে উঠেছে এ তারই অবদান। সেজন্য তাঁকে শিল্পাচার্যের সম্মান দেওয়া হয়েছে। সৃজনী উৎকর্ষ, নবউদ্ভাবনী কৌশল ও শিল্পে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করার জন্য তিনি ছিলেন অগ্রণী এক শিল্পী।

এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। জয়নুল আবেদিন নবঅর্জিত রাষ্ট্রে এসে এখানকার নবীন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে

গভীর সখ্য গড়ে তোলেন। এঁদের একাংশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। মননে উজ্জ্বল এসব বুদ্ধিজীবী জয়নুল আবেদিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জয়নুল আবেদিন একটি শিল্প-শিক্ষালয় গড়ে তোলার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন। তাঁর এ-প্রচেষ্টায় প্রগতিশীল এসব বুদ্ধিজীবীর শুধু সমর্থন ছিল না, তাঁরা এ-আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের কয়েকজনের উৎসাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ডাইনিং রুমে একদিনের একটি প্রদর্শনীও হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার সঙ্গে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের সম্যক পরিচয়করণ।

জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক স্কুলজীবনের শেষ পর্বে ১৯৩৩ সালে এক অনমনীয় জেদ নিয়ে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তৎকালে চারুকলা নিয়ে পঠন-পাঠনের বিষয়ে কোনো মুসলিম পরিবার থেকেই তেমন উৎসাহ দেওয়া হতো না। ধর্মভীরু মুসলিম পরিবারে ছবি রাখা, ছবি আঁকায় ছিল দুস্তর বাধা। প্রায় অসম্ভবের সাধনা। চারুকলায় অধ্যয়ন করলে আর্থিক দিক থেকে খুব যে লাভবান হবে—এ খুবই দুরাশা ছিল। সেজন্য আর্ট স্কুলে শিক্ষার জন্য জয়নুল আবেদিনকে বিরতিহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে। পিতা ছিলেন অল্প বেতনের পুলিশ কর্মচারী। কলকাতায় পড়াশোনার জন্য যে অর্থসংকুলান করা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রীর একটি মনোগ্রাহী সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, সেজন্য ছাত্রাবস্থায় জীবনধারণ ও শিল্পশিক্ষা অব্যাহত রাখতে তাঁকে বিরতিহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে। থাকতেন কলকাতার বালিগঞ্জের সন্নিকটে বন্ডেল রোডে একটি অপরিসর ঘরে। অন্যদিকে অবসর সময়ে নানা জায়গায় বাণিজ্যিক কাজ করে দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করতে হতো তাঁকে। পরে যখন বাণিজ্যিক কাজ করে একটু সচ্ছলতা এসেছিল, তখন তিনি সার্কাস রো-তে একটি বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। [চলবে]

■ Aveyj nvmbv2
Kvwj I Kjg

প্রকল্প সংবাদ

সম্মিলনী সভা

মেধা লালন প্রকল্প'র পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশাল বিভাগে অবস্থান/অধ্যয়নরত প্রকল্পের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে গত ০৯ ডিসেম্বর '১৭ (শনিবার) বরিশাল শহরস্থ হোটেল রিভার ক্যাফের সম্মেলন কক্ষে এক সম্মিলনী সভার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় এনজিও কর্মী এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা সহ মোট ২২ জন উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ৮৫ ব্যাচের প্রাক্তন সদস্য ড. মো. কবির মিয়া, কনসালটেন্ট, বরিশাল জেনারেল হসপিটাল এবং ড. মো. খাদেমুল ইসলাম, জুনিয়র কনসালটেন্ট, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল। মেধা লালন প্রকল্প'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এর বর্তমান কার্যক্রম, প্রকল্প'র সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক বাড়াতে করণীয়, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু প্রকল্পের নবীন সদস্যদেরকে সহয়াতা প্রদান, ফাউন্ডেশন থেকে নেয়া শিক্ষাঋণের গুরুত্ব অনুধাবন এবং তা যথাসময়ে ফেরত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি এই প্রকল্পের ভবিষ্যত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে করণীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্মিলনী সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

অভিনন্দন

প্রকল্পের ২০১৫ ব্যাচের সদস্য আব্দুল্লাহ সাদমান জামী (সদস্য নং: ১১৭৬), ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রথম সারির কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেতে সক্ষম হয়েছে। সে এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটে মেধা তালিকায় ২য় এবং 'গ' ইউনিটে ১৩৯তম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া, সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সি' ইউনিটে ১ম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি' ইউনিটে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, সাদমান জামী জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৪ এর বিভাগীয় রানার্সআপ এবং দুদক আয়োজিত কলেজ পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৬ এর জাতীয় বিজয়ী দলের অন্যতম সদস্য। সাদমান জামী জয়পুরহাটের রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ ৫.০০ এবং ২০১৬ সালে রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ ৫.০০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তার এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

রাবেয়ার বিয়ে

মো. মানিক মিয়া
সদস্য নং ১২৪৭/২০১৬

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার ও তুমুল বৃষ্টির দিন। আমরা শুধুমাত্র ৪ জন স্কুলে এসেছি, ম্যাডাম সহ ৫ জন। সেদিনও দেখা গেল রাবেয়া স্কুলে আসেনি। রাবেয়া বৃষ্টি বাদল কিছুই মানে না কারণ সে স্কুল কখনও ফাঁকি দেয় না। ম্যাডাম ও আমরা তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী সিমুকে জিজ্ঞাসা করলাম তার ব্যাপারে জানার জন্য, সেও বলল ওর সাথে বেশ কিছুদিন আগে থেকে তেমন কোন কথা-বার্তা/যোগাযোগ হয় না। পরে ম্যাডাম বলল আগামী শনিবার সে না আসলে আমরা তার বাসায় যাব।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমরা ৩ বন্ধু, আমি, সোহেল ও তৌকির ভাবলাম কেন সে আসছে না। এরই মধ্যে তৌকির বলল ভাবার দরকার নেই কারণ আমরা তো আগামী দিন যাচ্ছি খোঁজ নিতে। তৌকির একটু সাদা মনের মানুষ এতো।

পরের দিন আমরা সবাই স্কুলে এলাম, ম্যাডামও এলেন কিন্তু রাবেয়ার কোন খোঁজখবর নেই। পরে ১০টার দিকে আমরা চার জন ও ম্যাডাম সহ রাবেয়ার বাড়িতে গেলাম। বাসায় গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতে তার মা আমেনা বেগম আমাদের দেখল। তিনি দেখার পর থেকে বলতে লাগল 'হামার অত টাকাও নাই ছাওয়াক লেখাপড়া করার, আর হামাগুলো বুড়াবুড়ি হয়া গেছি, একন নাতি-নাতনির মুখ দেখবার মন চাইছি।'

আর ওদিকে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার অবস্থা ছিল করুণ তার পরনে পোশাক ছিল এবড়ো-থেবড়ো, সে ম্যাডামকে দেখে তৎক্ষণাৎ একটি টুল এনে দিল এবং সালাম জানাল।

একটু পরে রাবেয়ার মাকে আমরা ম্যাডামের কাছে ডেকে আনলাম। উনি বলতে লাগল, 'হামা গরিব মানুষ দিন আনি দিন খাই, হামার বসার সময় নাই, অনেক কাজ-কর্ম আছে।' এদিকে আমাদের দলের সাদা ব্যাটা বলতে লাগল রাবেয়ার মাকে 'আপনি আবার রাবেয়াকে বিয়ে দিবার জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিছেন কেন?' রাবেয়ার মা একটু রেগে উঠেছিল বোধ হয়, তবে ভালো হলো। দলের সাদা ব্যাটা বিষয়টা ধরতে পেরেছিল।

ম্যাডাম আমেনা বেগমকে বলতে লাগল 'আপনার মেয়ে রাবেয়া ভালো ছাত্রী, এখন বিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। সবে মাত্র ৫ম শ্রেণিতে পড়ে, বয়স বোধ হয় ১০-১১ হবে। তাকে এতো অল্প বয়সে বিয়ে দিলে তার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হবে। আর এটা তো জানেন না' বাল্যবিবাহ আইনত দণ্ডনীয়। এ বিবাহ করালে আপনার পরিবারে অশান্তি নেমে আসবে।'

আমেনা বেগম এত কিছু শোনার পরও বলে এক কথা হামার ওতো টাকাও নাই আর হামা ওতো লেখাপড়া না করাই। আর এই সময় ছাওয়ার জন্য ভালো ভালো বরও আসবার নাগছি। অবশেষে আমরা রাবেয়াকে স্কুলে আসার সম্মতি জানিয়ে আসলাম।

কয়েকদিন পার হয়ে গেল কিন্তু আবার রাবেয়ার কোনো খোঁজখবর নেই। রাবেয়ার এ ব্যাপারে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে।

এদিকে আমরা চার জন ভাবি রাবেয়ার জন্য কি করা যায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় ইদানিং নাকি রাবেয়ার জন্য ভালো বিয়ের খবর আসছে। আবার কেউ কেউ নাকি পণের টাকা না নিয়ে রাবেয়াকে নিতে চায়। একদিন ম্যাডাম আমাদের চার জনকে ডেকে বলল, তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। তৌফিক বলল কি কাজ আবার করতে হবে? ম্যাডাম আমাদের বিষয়টা বলল। আমিও সে ব্যাপারে বেশ কিছুদিন আগে থেকে চিন্তা করেছিলাম। বিষয়টা হচ্ছে 'বাল্যবিবাহ' সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে অবহিতকরণ। যাতে গ্রামের মানুষ বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়। এবং মূল উদ্দেশ্য হবে রাবেয়ার বিবাহ বন্ধ।

আমরা বেশ কয়েকজন ম্যাডামের পরামর্শ মোতাবেক কার্যক্রম শুরু করতে লাগলাম। তবে নাট্যমঞ্চে উপস্থাপন করা হবে দুইটি পরিবারের মধ্যে। একটি কনে পরিবার অপরটি বর পরিবার। যাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সংঘঠিত হবে এবং এ ব্যাপারে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে উভয় পরিবারের যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

আমরা অবশ্য এগুলো ঠিকঠাক করলাম। অবশেষে ম্যাডামের পরামর্শে মঙ্গলবার বেলা ১০টায় গ্রামের মাতব্বর জামান উল্লাহর বাড়িতে নাট্যমঞ্চ বাস্তবে রূপদান করা হবে তা গ্রামের সকল শ্রেণির লোকদের জানানো হলো। তবে বিশেষ দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হলো রাবেয়ার বাবা-মা শফিক ও আমেনাকে।

ইনশাল্লাহ সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা সেদিন বাল্যবিবাহ সর্ম্পকের নাট্যমঞ্চ সকলের সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছিলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাতব্বর জামান উল্লাহসহ আরো অনেকে। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ ও আইনগত দণ্ডনীয় কার্যক্রমগুলো উপস্থাপন করেছিলাম। সেখানে লক্ষনীয় বিষয়সমূহ ছিল :

মেয়েদের বিয়ে ১৮ বছরের নিচে নয়।
ছেলেদের বিয়ে ২১ বছরের নিচে নয়। অন্যথায়,
যে কাজী বিবাহ সংঘটিত করাবে তার যথাযোগ্য শাস্তি।
বর ও কনের উভয়ের কর্তৃপক্ষকে ১০০০টাকা জরিমানা ও ৫ বছরের জেল।

এছাড়াও মেয়েদের বাল্যবিবাহের কারণে যে, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। অবশেষে মাতব্বর জামান উল্লাহ আমাদের কথায় একমত হয়ে বললেন যে 'এরকম ঘটনা যদি আমার এলাকায় ঘটে তবে তাদের বিরুদ্ধে আমি আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

সেখানে রাবেয়ার বাবা-মা, আমাদের নাট্যমঞ্চ ও জামান উল্লাহর কথা শুনে তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তারা বলল যে, আমরা আমাদের মেয়ে রাবেয়াকে এখনে বিয়ে দেব না যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত বয়স না হয়, এবং তাকে স্কুলে পাঠানোর কথাও বলে।

এটা শুনে ম্যাডাম ও আমাদের চার জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেন না আমরা আমাদের বিষয়টি/উদ্দেশ্যটি হাসিল করতে পেরেছিলাম। পরের দিন সকাল ৮টায় রাবেয়া আমাদের সাথে স্কুলে যায় এবং পুনরায় লেখাপড়া শুরু করে। সেই রাবেয়া এখনো তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

মন বসে না পড়ার টেবিলে আছে কি উপায়?

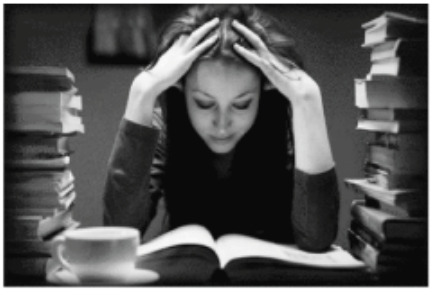

অবশ্যই আছে! একটি না, দুইটি না, অনেকগুলো উপায়ই আছে। পড়তে বসলেই আমাদের মন এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে অন্য দুনিয়ায় মজে যায়। মাঝখান দিয়ে পড়াশোনা চলে যায় গোল্লায়! তাই পড়ার প্রতি 'মনোযোগ বৃদ্ধিতে' কি কি করা যায়, তা নিয়েই এই লেখা।

১৫। Study Music : ইউটিউবে Study Music লিখে সার্চ করলেই আপনি সন্ধান পেয়ে যাবেন অসংখ্য মিউজিকের। পড়ায় মনোযোগ বাড়াতে এগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। এখন থেকে তবে পড়ায় মনোযোগ না বসলে যে-কোনো একটি মিউজিক চালু করে পড়তে বসুন। ইউনিভার্সিটির সিনিয়র প্রীতম ভাইয়ের কাছ থেকে শেখা এই পদ্ধতি কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সত্যিই কাজে লেগেছে!

১৪। Think Big, Start Small : আপনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ একটানা পড়ার চেষ্টা করেন কিন্তু মনোযোগ হারিয়ে যাওয়ায় তা আর সফল হয় না। তাই এখন থেকে ছোট একটি সময় নির্ধারণ করে পড়া শুরু করুন। প্রথম কয়েকদিন ২০ মিনিট পড়ুন ও ১০ মিনিট বিরতি নিন। এরপর আবার ২০ মিনিট পড়ুন ও আবার বিরতি নিন।

ধীরে ধীরে, কয়েকদিন পর ৩০ মিনিট, এরপর ৪০ মিনিট, এরপর ৫০ মিনিট–এভাবে সময়টিকে বাড়িয়ে নিন ও নিজের 'মস্তিষ্ককে অভ্যস্ত করান'। দেখবেন আপনি ঠিকই একটি সময় পরে একটানা পড়তে পারছেন।

১৩। পর্যাপ্ত ঘুম : একজন মানুষের দৈনিক ৭-৮ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পরিমাণ না ঘুমালে মস্তিষ্ক ঠিকমত কাজ করে না এবং মনোযোগও কমে যায়। তাই অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম সম্পন্ন করতে হবে (ঘুমটি বাসায় সম্পন্ন করবেন, ক্লাসে না!)

১২। পানি খাচ্ছেন তো?

ড়ার সময় আপনার মস্তিষ্ক কিন্তু অনেক খাটনি করে আর এই খাটনি করতে তার প্রয়োজন হয় প্রচুর পানি! তাই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খেয়ে তাকে আর্দ্র রাখুন। নাহলে কিছু সময় পরেই আপনি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবেন।

১১। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পড়তে বসবেন : খাতা, বই, নোট, কলম, পেন্সিল, স্কেল, রাবার, শার্পনার, জ্যামিতি বাক্স, স্ট্যাপলার, গ্রাফ পেপার ইত্যাদি সবকিছু আগে থেকে একসাথে নিয়ে পড়তে বসুন। ভুলে রেখে এসেছেন বলে বারবার টেবিল থেকে উঠতে হলে মনোযোগ হারিয়ে যায়।

১০। কঠিন পড়াগুলো আগে পড়ে ফেলুন : এর কারণ হলো, কঠিনগুলো আগে পড়ে ফললে আপনার মস্তিষ্ক বুঝবে যে পরবর্তীতে যেই পড়াগুলো আসছে, সেগুলো সহজ। ফলে আপনি চিন্তামুক্ত থাকবেন। আর যদি সেই পড়াগুলো পরে পড়ার জন্য রেখে দেন, মস্তিষ্ক অনবরত ভাবতে থাকবে যে 'সামনে কঠিন পড়া আসছে' এবং ফলশ্রুতিতে চাপ সৃষ্টি হবে ও আপনি সেই চাপ থেকেই দ্রুত মনোযোগ হারাবেন। তাই আগে আগেই সেরে ফেলুন কঠিন পড়াগুলো!

৯। Peak Concentration Time : সেই সময়ে পড়তে বসবেন যখন 'আপনার' সবচেয়ে বেশি মনোযোগ থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই বিচিত্র এবং বিচিত্র তাদের মস্তিষ্কও। আপনার যদি বেলা ৩টা হতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যের সময়ে বেশি ভালো পড়া হয়, তাহলে ঐ সময়েই পড়তে বসবেন। কম সময়ে বেশি পড়ে কে না লাভবান হতে চায়?

৮। পড়ার জন্য যেমন পরিবেশ চাই :

–এমন কোথাও পড়ুন যেখানে Distraction সবচেয়ে কম

–যেখানে মানুষের কথা/হাসির শব্দসহ যাবতীয় সব শব্দ ন্যূনতম অবস্থায় থাকবে

–মোবাইল ফোন অবশ্যই সাইলেন্ট করে পড়তে বসবেন

–টেবিলে বসে পড়ার চেষ্টা করুন, বিছানা কিংবা সোফায় নয়।

৭। আশেপাশের শব্দ হজম না হলে–

পাশের বাসার আন্টি এসে গল্প জুড়ে দিয়েছে আপনার মায়ের সাথে। অন্যদিকে দাদি আর বড়ো বোন মিলে টিভিতে উঁচু ভলিউমে স্টার জলসা দেখছেন। মায়েদের হাসির বিকট শব্দ ও নাটকের চরিত্রদের আওয়াজ উপেক্ষা করে কোনোভাবেই পড়ায় মন দিতে পারছেন না। চিন্তা নেই! ইউটিউব বা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিন 'White Noise'।

White Noise আপনার মস্তিষ্কের মনোযোগকে 'একটি জায়গায়' নিয়ে আসতে সাহায্য করে। অতএব কানে হেডফোন গুঁজে নিয়ে White Noise চালু করুন এবং পুনরায় ফোকাস করুন নিজের পড়ায়!

৬। নিজেকে নিজেই পুরস্কার দিন : নিজেকে বলুন : 'আমি আগামী ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের ৩ পাতা পড়ে শেষ করব এবং তা সফলভাবে করতে পারলে আমার প্রিয় গান 'ও বন্ধু লাল গোলাপি' শুনবো কিংবা ফ্রিজে রাখা চকলেটটি খাবো কিংবা বন্ধুকে কল করে ৫ মিনিট গল্প করব'। এতে করে আপনি নিজেকে অনুপ্রাণিত রাখতে পারবেন এবং ভালো ফল নিশ্চয়ই পাবেন।

৫। Worry Time to Study Time : সময় কম কিন্তু সিলেবাস অনেক বেশি এবং আপনিও কিছুই পড়েন নি এখনো। এমন সময়গুলোতে 'কিছু পারি না! কিছু পারব না! কীভাবে পড়ব এতো কিছু' ইত্যাদি বলে হা-হুতাশ করতে করতেই কিন্তু আপনি সময় নষ্ট করে ফেলেন।

তাই আপনার Worry Time কে তখন Study Time-এ পরিণত করতে হবে। সময় তো এমনিতেই কম! প্রতিটি মিনিটেরই অনেক মূল্য। তাই সময়টা 'দুশ্চিন্তা'য় বিনিয়োগ না করে 'পড়ায়' বিনিয়োগ করুন।

৪। মেডিটেশন : মেডিটেশন আপনার মনোযোগ বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করবে। তবে যদি আপনার সময় কম থাকে, আপনি নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করতে পারেন।

–ঘুম থেকে উঠে ৫ মিনিট যে-কোনো 'একটি আওয়াজের প্রতি' মনোনিবেশ করুন। তা হতে পারে সকালবেলার পাখির ডাকের শব্দ, ফ্যানের শব্দ, এমনকি বাইরের গাড়ির হর্নের শব্দ (যে-কোনো একটির প্রতি মনোনিবেশ করুন)

–বিরতিতে গেলেই চোখ বন্ধ করে কয়েকটি গভীর নিশ্বাস নিন। ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন প্রবাহ বৃদ্ধি হবে এবং আপনি সতেজ অনুভব করবেন।

৩। Forest : যাদুকরী একটি অ্যাপ!

এই অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোন–দুটির জন্যই পাবেন। এখানে আপনি একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিবেন। ধরুন ৩০ মিনিট নির্ধারণ করলেন। সেই ৩০ মিনিটে স্ক্রিনে দেখবেন যে একটি বীজ থেকে চারা এবং চারা থেকে গাছ তৈরি হচ্ছে। তবে শর্ত হলো, ঐ ৩০ মিনিটে আপনি ফোনে হাত দিতে পারবেন না। ফোনে হাত দিলেই গাছটি নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, নিজেকে ফোন হতে দূরে রাখতে এবার ফোনটাই ব্যবহার করুন ভিন্নভাবে!

২। 'WHY SHEET' তৈরি করুন : পড়তে বসলে মন যখন এদিক-ওদিক চলে যায়, মনকে তখন বশ মানাবে এই WHY SHEET।

এই মুহূর্তে পড়লে আপনার কি কি ফায়দা হবে তা চিন্তা করুন। আপনার মানসিক কি সুবিধা হবে, আর্থিক কি সুবিধা পেতে পারেন- এভাবে চিন্তা করুন। যেমনঃ ঢাবিতে চান্স পেতে হবে, স্কলারশিপ পেতে হবে, বাবা-মা খুশি হবে, সকালে গ্রুপ স্টাডিতে বন্ধুদের বুঝাতে পারব ইত্যাদি হতে পারে উত্তরগুলো। এবারে এগুলো একটি কাগজে লিখে নিয়ে টেবিলের উপর এমন ভাবে বা এমন স্থানে লাগিয়ে রাখুন যেন বই থেকে চোখ তুললেই আপনি তা দেখতে পান।

এটি আপনাকে Instant Motivation দিবে পড়ার জন্য। বিশ্বাস করুন, খুবই কার্যকরী এটি।

১। অবচেতন মন ও অচেতন মনের সমন্বয় (Combination of Subconscious Mind & Conscious Mind) :

পুরো লেখার মধ্যে এই পয়েন্টটি আপনাকে শুধু পড়ার টেবিলে নয়, জীবনের প্রতিটি কাজ করার ক্ষেত্রে ফোকাস করতে শিখাবে। দেখুন তবে।

Subconscious Mind-এ :

–আপনি সেই কাজগুলো করেন যেগুলো করতে আপনার 'আলাদা মনোযোগ' দিতে হয় না

–কাজগুলো সব স্বাভাবিক নিয়মেই হতে থাকে এবং আপনি বুঝতে পারেন যে কাজটি হচ্ছে কিন্তু আপনার নিজের 'মনকে বুঝাতে হয় না' যে আমি কাজটি করছি।

–আবার বলছি, আপনার মনকে 'আলাদা করে বোঝাতে হয় না' যে আপনি এই কাজটি করছেন

ঘুরে আসুনঃ ছাত্রজীবনের বহুল প্রচলিত ৫টি সমস্যা এবং সমাধান!

–উদাহরণ : কোনো টিভি বিজ্ঞাপন দেখার সময় আপনি ডায়লগও শুনতে পান, সেই সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু মিউজিকও শুনতে পান। এখন বলুন তো, আপনি আলাদা মনোযোগ দিয়ে কোনটি শুনছেন? অবশ্যই ডায়লগগুলো। কিন্তু আপনি তো আবার মিউজিকও শুনছেন! আপনি কি তাহলে মিউজিকের প্রতি 'আলাদা মনোযোগ' দিচ্ছেন? না, দিচ্ছেন না।

অর্থাৎ, এই মিউজিক শোনার কাজটিই আপনি করছেন অবচেতন মনে। একটি Subconscious+Conscious Mind-এর কম্বিনেশনে কাজ দুটি করছেন।

Conscious Mind-এ :

–আপনি সেই কাজগুলো করেন যেগুলো করতে আপনার 'আলাদা মনোযোগ' দিতে হয়

–আপনার নিজের 'মনকে বোঝাতে হয়' যে আমি কাজটি করছি।

–উদাহরণ : আপনি যখন এই ব্লগটি পড়ছেন তখন আপনার মন জানছে যে, 'হ্যাঁ, আমি এই মুহূর্তে একটি ব্লগ পড়ছি'। অতএব, আপনি কিন্তু এখন 'একটি' কাজের প্রতি ফোকাস করছেন। আবার, ইউটিউবে ১০ মিনিট স্কুলের একটি ভিডিও দেখার কাজটিও কিন্তু আপনি Conscious Mind এই করেন।

তাহলে আমরা এই মন্তব্যে আসতে পারি যে :

* Subconscious Mind+Conscious Mind Combination-এ আপনি 'দুইটি' কাজ একসাথে করতে পারেন এবং দুইটির একটিতেও কোন বাধা সৃষ্টি হয় না ও ফোকাসও নষ্ট হয় না। (বিজ্ঞাপন দেখার উদাহরণটি পড়ে বুঝুন)

* Conscious Mind+Conscious Mind Combination-এ আপনি 'দুইটি' কাজ একসাথে করলে দুটিতেই ব্যাঘাত ঘটবে এবং ফোকাস নষ্ট হবে। (উদাহরণঃ একসাথে যদি এই ব্লগটিও পড়েন এবং অন্যদিকে একটু একটু পর এরই মাঝে কোনো ভিডিও দেখেন, কোনোটাই ঠিকমত করতে পারবেন না। কারণ : দুইটি কাজের জন্যই আপনার Conscious Mind প্রয়োজন হচ্ছে। আপনার ব্রেইন তখন দুই দিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছে এবং এখানেই আপনি ফোকাস হারিয়ে ফেলছেন।

সিদ্ধান্ত

–পড়াশোনা করার কাজটি ঘটে Conscious Mind-এ। অতএব, পড়ার সময় এমন কোনো কাজ করবেন না, যেটা করতেও Conscious Mind প্রয়োজন হয়, যেটা করতে আপনার ব্রেইনকে আলাদা মনোযোগ দিতে হয়। যেমন ধরুন : পড়ছেন এবং পাশাপাশি ফেসবুক ব্যবহার করছেন। এমন করলেই আপনার ব্রেইন দুইদিকে ফোকাস করার চেষ্টা করবে এবং ফলশ্রুতিতে কোনোটাতেই ফোকাস হবে না।

–অতএব পড়ার সময় শুধুই পড়ুন।

–কিংবা Subconscious Mind+Conscious Mind কম্বিনেশনে পড়ুন। যেমন : স্টাডি মিউজিক শুনুন ও পড়ুন। কিংবা অংক করার সময় গান শুনুন। আপনি এই ক্ষেত্রে Subconscious Mind-এ গান শুনবেন এবং Conscious Mind-এ পড়বেন। ফলে কোনো কাজেই ব্যাঘাত ঘটবে না বরং আপনি পড়ায় ফোকাস করতে পারবেন।

–পড়াশোনাটা যদি ল্যাপটপে ও ইন্টারনেটে থাকে, তাহলে একাধিক ট্যাব না খুলে পড়ার চেষ্টা করুন।

উপরে বর্ণিত প্রতিটি কাজ ধীরে ধীরে অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসলে অবশ্যই পড়ার টেবিলে আপনার মন বসবে বলে আশা করি। খুব বেশি কঠিন কিন্তু নয় কাজগুলো! সবার জন্য শুভ কামনা।

॥ সূত্র : 10minuteschool.com

আমাদের শীতকাল

শীত মানেই হিমহিম কনকনে ঠাণ্ডার অনুভূতি। ইউরোপ-আমেরিকা বা অন্যান্য শীতপ্রধান দেশগুলোতে শীতকালে বরফ পড়ে। তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের অনেক নিচে; জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে স্থবির–অনেক মানুষ মারাও যায়। জানা যায়, শুধু ইউরোপ-আমেরিকা বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেই নয়, আমাদের এই এশিয়ার অনেক দেশেই চলে হাড়-কাঁপানো শীতের দাপট। ১৯৬৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চীনের মোহে কাউন্টিতে সে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে। তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের নিচে ৫২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (৫২.৩ ডিগ্রি)।

জাপানের হোক্কাইডোর আশহিকাওয়ায় ১৯০২ সালের ২৫ জানুয়ারি সে দেশের এ যাবতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়–হিমাঙ্কের নিচে ৪১ (৪১) ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৯৯ সালের ১৫ মে নেপালের হিমালয়-সংলগ্ন সাগরমাথা অঞ্চলে (ঋধমধৎসধঃযধ তড়হব) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় হিমাঙ্কের নিচে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইরানের সাক্কেজে ১৯৬৯ সালের শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ যাবতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড হলো আলাস্কার প্রোসপেক্ট ক্রিকে–১৯৭১ সালের ২৩ জানুয়ারি, হিমাঙ্কের নিচে ৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কানাডার ইয়োকোনে দেশটির এ যাবতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হিমাঙ্কের নিচে ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই তুলনায় আমাদের শীতকাল অনেকটা সহনীয়। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে না। ভয়াবহ তুষার-ঝড় প্রকৃতিকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় না। তাপমাত্রাও হিমাঙ্কের ওপরেই থাকে; তবে কোনো কোনো বছর উত্তরাঞ্চলসহ দেশের কোনো কোনো এলাকায় তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার রেকর্ডও আছে–হিমাঙ্ক ছুঁই-ছুঁই অবস্থা প্রায়। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে তাপমাত্রা নেমে যায় ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা আমাদের দেশে এ যাবতকালের সবচেয়ে বেশি শীতের রেকর্ড। শীতকালে, বিশেষ করে মাঘের কনকনে শীতে আমাদের দেশের অনেক গরিব মানুষ কষ্ট পায়। এমনকি শীতের প্রকোপে কোনো কোনো বছর দু-একজন মানুষ মারা যাওয়ার খবরও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু। এর মধ্যে পৌষ ও মাঘ মাস হলো শীত ঋতু। কথায় বলে–'মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে'। শুধু বাঘ নয়, পৌষ-মাঘে যখন কনকনে শীত পড়ে তখন অনেক মানুষও কাঁপে শীতে–বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষেরা। কিন্তু শীত শুধু হাড়ই কাঁপায় না; নানান বৈচিত্র্য আর মজাদার উপহারের ডালি নিয়েও আসে আমাদের জন্য। শহরে লাখ লাখ মানুষের বসতি। অগণিত বিজলী বাতি। অনেক দোকানপাট আর কলকারখানা। তাই গ্রামের তুলনায় আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা কম। শীতের আসল চেহারা আর রূপ পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায় গ্রামে। পৌষ-মাঘ এই দুই মাস শীতকাল হলেও অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় শীতের আনাগোনা। তবে হাড়কাঁপানো শীত বলতে যা বোঝায় তার দেখা পাওয়া যায় পৌষ-মাঘ মাসে। এমনকি ফাল্গুনের শেষাবধিও তার রেশ থেকে যায়, তবে দাপট অনেক কম।

শীতে বাংলাদেশের গ্রাম-প্রকৃতি সন্ধ্যার আগে থেকেই শিশির আর কুয়াশার চাদর মুড়ি দিতে শুরু করে। মানুষজন বেশ সকাল-সকালই

ঘরে ফেরে। গবাদি-পশুরও আশ্রয় হয় গোয়ালে বা নির্দিষ্ট স্থানে।

শীতের হিমশীতল গ্রাম-বাংলায় খুশি আর

আনন্দের আয়োজনও রয়েছে প্রচুর। চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন এলাকায় খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ ও গুড়-পাটালি তৈরি হয়। এ উপলক্ষ্যে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে যায় যেন। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশকিছু জেলায় খেজুর রস থেকে চমৎকার গুড় ও পাটালি তৈরি হয়। তবে সব এলাকায় অতি উন্নত মানের চমৎকার নান্দনিক পাটালি তৈরি হয় না। অনেক ধৈর্য, শ্রম আর যত্নসহকারে এই বিশেষ সুস্বাদু আর শৈল্পিক পাটালি তৈরি করেন পাটালির কারিগর তথা শিল্পীরা। শুধু গুড়-পাটালি-পিঠেপুলি-ক্ষির-পায়েস আর মোয়া নয়, হরেক রকম তরিতরকারি, শাকসবজি বাড়িতে বাড়িতে; খেতে-পালানে। শীতকালের এসব দৃশ্য দেখলে মনে হয়, শাক-সবজির এই অফুরন্ত সম্ভারই যেন ঋতুর বিশেষ উপহার; এ সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের মহিমা যেন অন্য ঋতুতে তেমন মানানসই হতো না। লাউ-কুমড়ো-ফুলকপি-বাঁধাকপি, মূলো, পালংশাক, শালগম, বেগুন, টমেটো, মেটে-আলু, পেঁয়াজের কলি এসব তরকারি রাশি রাশি। কী তরতাজা আর কী স্বাদ সেগুলোর!

বিল-বাওড় আর নদী-খালের মিঠেপানির হরেক রকমের মাছ আমাদের শীতকালের আরেকটি উপহার। শুধু গ্রামে নয়, শহর-গঞ্জের বিভিন্ন বাজারেও শীতের নদী-খাল, বিল-বাওড় থেকে ধরা টাটকা ও 'লাফানো-মাছ' দেখা যায়, কিনতে পারা যায়। বড়ো বড়ো শৈল-বোয়াল-গজার-টাকি, শিং-মাগুর-কৈ-মেনি, খয়রা-পুটি-সরপুটি-বাইন-পাবদা-ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের স্বাদ যেন শীতকালে অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে, গ্রামের গেরস্থ বাড়িতে রাতে রান্না করে-রাখা বড়ো বড়ো তারাবাইন, শৈল, কই, পাবদা কিংবা সরপুটি-মেনি সকাল বেলায় ঠান্ডা কড়কড়ে ভাত দিয়ে খাওয়ার যে কী মজা তা যে খেয়েছে সে ছাড়া অন্য কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।

অগ্রহায়ণ মাসে সীমিত আকারে আমন ধান কাটা শুরু হলেও পৌষের শুরুতে ধান কাটা পুরোদমে শুরু হয়ে যায় গাঁয়ের মাঠে মাঠে। মাঠভরা থোকা থোকা আমন ধানের সারি সারি গাছগুলো হাওয়ায় দোলে। মাথাভরা যেন ছোটো ছোটো সোনার টুকরো—সোনার ধান। চাষিদের স্বপ্নের প্রতীক। খুশি আর আনন্দের বার্তাবহ। সোনালি ধানের সোনালি আভা লক্ষ লক্ষ চাষির মুখে হাসি ছড়ায়। বুকে আশা জাগায়। তাই তো মাঠজুড়ে ধান কাটার ব্যস্ততা—যেন আগামী দিনের নতুন স্বপ্নপূরণের মহোৎসব। সেই ধানে ভরে ওঠে কৃষকের গোলা, আউড়ি, ডোল। চাল তৈরির কল এখন গ্রামে পৌঁছে যাওয়ায় ঘরে ঘরে ঢেঁকিতে আর আগের মতো ধান ভানার দৃশ্য দেখা যায় না। তার পরও শীতকালে এখনও গ্রামবাংলার গেরস্থ বাড়িতে ঢেঁকিতে চিড়ে কোটার ধুম লাগে। বানানো হয় চাউলের গুঁড়ি-পিঠেপুলির জন্য। ঢেঁকির একটানা চুকুর চুকুর শব্দ শুনতে বেশ লাগে। উঠোনের কোনায় বড়ো চুলোয় নতুন চালের মুড়ি ভাজার ব্যস্ততাও চোখে পড়বে। সকালের মিষ্টি রোদে বসে খেজুরের রসে ভেজানো মুড়ি, গুড়-মাখানো মুড়ির মোয়া কিংবা নোলেন পাটালি দিয়ে মচমচে মুড়ি খাওয়ার কথা মনে হলেই জিবে পানি এসে যায়।

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আলো-আঁধার এসব নিয়েই আমাদের জীবন। আমাদের এগিয়ে চলা। তাই শীত যেমন কষ্টের তেমনি অনেককিছু পাওয়ারও ঋতু। আমরা যদি গরিবদের প্রতি সাহায্য ও মমতার হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলে তারাও শীতের কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা সবাই তখন শীতের আনন্দ-উপহারগুলো ভাগ করে নিতে পারব।

■ মুস্তাফা মাসুদ
ইত্তেফাক ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

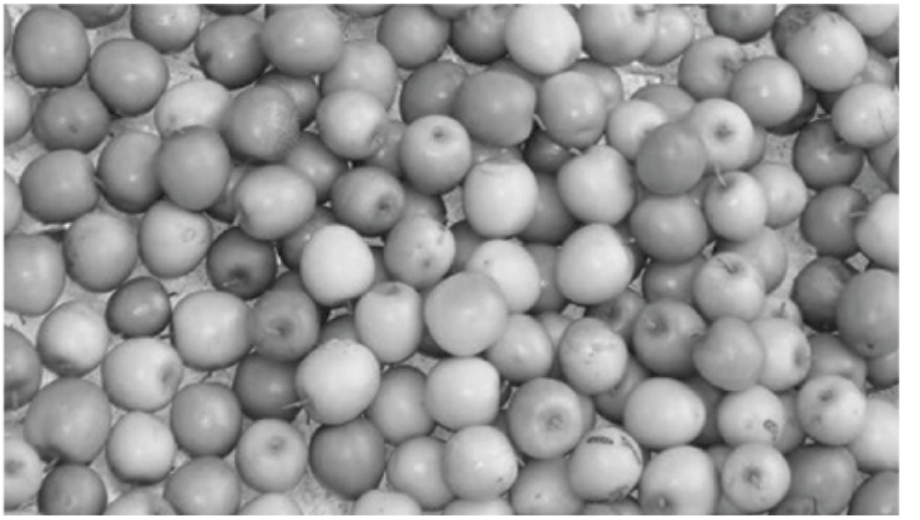

বরই ফলের এত গুণ!

সবুজ, লাল-সবুজ-হলুদ রঙের ছোটো ছোটো ফলগুলো দেখলেই জিভে জল এসে যায়। এগুলো দেখতেই সুন্দর না খেতেও অনেক সুস্বাদু। টক বরই, দেশি কুলবরই, বিদেশি কুলবরই, মিষ্টি বরই নানা ধরনের বরই। আবার বরইয়ের আচার ছোটো-বড়ো সবাই পছন্দ করে। কুল বরইয়ের চাটনির কথা শুনলেও জিভে জল এসে যায়। আবার এর রয়েছে নানা ধরনের গুণ।

এরই মধ্যে বাজারে উঠতে শুরু করেছে বরই। বর্তমানে আমাদের দেশে চাষিরা নানা জাতের বরইয়ের চাষ করে থাকে। শীতের অন্যান্য ফসলের চাষের পাশাপাশি বরই একটি।

বরইয়ের গুণের কথা জেনে নিই

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রজাতির বরইয়ে বিদ্যমান ভিটামিন সি গলার ইনফেকশন জনিত অসুখ যেমন–টনসিলাইটিস, ঠোঁটের কোণে ঘা, জিহ্বাতে ঠান্ডাজনিত লালচে ব্রণের মতো ফুলে যাওয়া, ঠোঁটের চামড়া উঠে যাওয়া রোধ করে।

যকৃতের কাজের ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় বরই।

বরই এর রস অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ফলে রয়েছে ক্যানসার সেল, টিউমার সেল, লিউকোমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার অসাধারণ শক্তি।

উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এই ফল যথেষ্ট উপকারি। রক্ত বিশুদ্ধকারক হিসেবে এই ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ডায়রিয়া, ক্রমাগত মোটা হয়ে যাওয়া, রক্তের হিমোগ্লোবিন ভেঙে রক্তশূন্যতা তৈরি হওয়া, ব্রঙ্কাইটিস-এসব অসুখ দ্রুত ভালো করে বরই। খাবারে রুচি আনার জন্যও এই ফলটি ভূমিকা পালন করে।

মৌসুমি জ্বর, সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ।

স্ট্রেস হরমোন আমাদের মনে অবসাদ আনে, দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, নিদ্রাহীনতা তৈরি করে। নিদ্রাহীনতা দূর করে এই ফল।

এবং স্ট্রেস হরমোন নিসরণের মাত্রা কমায় এই ফল।

বরইয়ের খোসা খাবার হজমে সাহায্যে করে।

উচ্চমানের ভিটামিন এ রয়েছে এই ফলে।

আর ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং কোলস্টেরল কমানোর জন্য রয়েছে এর চমকপ্রদ ক্ষমতা।

সূত্র : arthosuchak.com

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি
শেষ পর্ব

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথম শ্রেণির চাকরি সবার কাছেই বহু প্রত্যাশিত একটি ব্যাপার। আর তা যদি হয় বিসিএস, তাহলে তো কথাই নেই। সবার কাঙ্ক্ষিত সেই বিসিএস নামক সোনার হরিণের খোঁজ পেতে এ পরীক্ষার দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো লিখিত পরীক্ষা। তাই লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আপনাকে এগিয়ে রাখতে নিজেদের বিসিএস অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরীক্ষার ধরন-ধারণ বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন যুগ্মসচিব ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক–অর্থ ও হিসাব কর্মকর্তা দেওয়ান সাইদুল হাসান এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সামিয়া আলম। লিখেছেন গোলাম রাব্বী।

বাংলা

বাংলা বিষয়ে শেষ সময়ে সাধারণ জ্ঞান নির্ভর বিশেষ করে এক কথায় উত্তর দিতে হবে, এমন সব গ্রামার বা সাহিত্যের অংশে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। এজন্য আরও একবার দেখে নিতে পারেন বিগত ১০ম বিসিএস থেকে ৩৫তম বিসিএসে আসা প্রশ্নগুলো। আর রচনা এবং পত্র লেখা সাধারণত সাম্প্রতিক বিষয়গুলোতে হয়। তাই আপনার নোট করা সব সাম্প্রতিক ইস্যুগুলোর নানা তথ্য-উপাত্ত আরেকটু মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারেন। আর মনে রাখবেন, রচনা লেখার ক্ষেত্রে সেটা 'উইথ কু' বা 'উইদাউট কু' যা-ই হোক না কেন, চেষ্টা রাখবেন নিজের মতো করে যতটা যুক্তি বা ডিফারেন্ট আইডিয়া, ইনফরমেটিভ ও গোছানো প্রেজেন্টশন দেয়া যায়।

ইংরেজি

ইংরেজিতে মোটামুটি অনেকেরই দুর্বলতা থাকে। তাদের জন্য অল্প সময় হলেও বেশি বেশি ইংরেজি দৈনিকের কলামগুলো পড়া জরুরি। একইসঙ্গে অনুবাদচর্চাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে রাফ করে লেখাটা উত্তম। কেননা, আপনি যদি রাফ করে না লিখেন তাতে সময় বাঁচলেও ওয়ার্ড সিলেকশন অতটা মজবুত বা যুতসই হবে না–এটাই স্বাভাবিক। আর রচনা লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলার মতো আপনার নোট করা সব সাম্প্রতিক ইস্যুগুলোর নানা তথ্য-উপাত্ত আরেকটু মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারেন। আর মনে রাখবেন, রচনা যতটা ইনফরমেটিভ বা তথ্য-উপাত্ত নির্ভর করা যায়।

গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

গণিতের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত চর্চা চালিয়ে যান। আর পরীক্ষার হলে যে নম্বরের সব কটি অঙ্ক আপনি পারবেন সেইগুলো আগে সম্পাদন করুন। আর অবশ্যই রাফ করার সুযোগটা গণিতে মিস না করাই ভালো।

অন্যদিকে এ বিষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মানসিক

দক্ষতা। এ বিষয়টি যেহেতু এমসিকিউ এবং যেহেতু এখানে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যায়, তাই এমন উত্তর দেয়া যাবে না যেটা ভুল হবে। সেজন্য মাথা ঠান্ডা রেখে, সামনে এগিয়ে যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণিত পার্টের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার পর অনেক ক্ষেত্রেই আর মাথা ঠান্ডা রাখাটা কষ্টের বটে। তথাপিও গণিত ও মানসিক দক্ষতা প্রমাণে আপনার ঠান্ডা মাথার আচরণটা বড়ো বেশি জরুরি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নম্বর তোলার ক্ষেত্রে দুই পার্টে হওয়া এ পরীক্ষাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণিতের মতোই এ বিষয়টিতেও যথাযথ উত্তর দিতে পারলে চলে আসে পুরো নম্বর। তাই খাতা ভরে লেখা নয় বরং যা চাওয়া হয়েছে ততটুকুই চিত্র ও যুক্তি সহকারে স্পষ্ট করে লিখুন।

আর প্রযুক্তি অংশে সচরাচর সাম্প্রতিক উদ্ভাবন নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে। তাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা মিডিয়ায় আসা বা প্রযুক্তির নিত্য-নতুন পরিবর্তন ও চমকপ্রদ বিষয়গুলোতে নজর দেয়ার পরামর্শ এ দুজনের পক্ষ থেকেই।

বাংলাদেশ বিষয়াবলী

বাংলাদেশ বিষয়াবলির জন্যও সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ঘটনা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ইতিহাস, অর্থনীতি, সরকারব্যবস্থা, আর্থসামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থাসহ মৌলিক নীতি ও অধিকার বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে ফেলুন চট করে। বাংলাদেশ বিষয়াবলী দ্বিতীয় পত্রের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ওপর বিশেষভাবে নজর দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন অভিজ্ঞরা।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

যুগ্ম সচিব দেওয়ান সাইদুল হাসান বলেন, বিশ্বের নানা প্রান্তে বর্তমান সময়ে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেদিকে নজর দেয়াসহ বেশি বেশি সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিওতে পড়া, বলা ও শোনাটা জরুরি। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্বের নানা আইন-আদালত ও রাষ্ট্রের নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে জ্ঞান থাকলে আপনিই পারবেন।

প্রফেশনাল ও বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

এ বিষয়ে ভালো করতে হলে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন সংগ্রহ করে ধারণা নেয়াটা উত্তম। কেননা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকজন বলেন, প্রফেশনাল ক্যাডারের ক্ষেত্রে আপনার অনার্স ও মাস্টার্সে পড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক টার্ম ও টপিকে নজর দিতে পারেন। তাতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যেমন বাড়বে, তেমন বেশি নম্বরসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ারও সহায়ক হবে।

এসইউ/এমএস

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি হতে পারে ভবিষ্যৎ পেশা

বায়োলজিক্যাল টেকনোলজির সংক্ষিপ্ত রূপ বায়োটেকনোলজি। বায়োলজিক্যাল টেকনোলজির আভিধানিক অর্থ জৈবপ্রযুক্তি। বায়োটেকনোলজি যার কাজ জেনেটিকস, প্রাণরসায়ন, টিস্যু কালচার, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদির সমন্বিত প্রক্রিয়া। 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' বাংলায় জিনতত্ত্ব প্রকৌশল। বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও কৃষিতে সমানভাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হচ্ছে। যে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি ব্যবহার করে জীবের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা হয় তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জেনেটিক মডিফিকেশন বলে। 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি'র বাংলাদেশে বিস্তার ঘটছে ভালোভাবেই। আর বিশ্বজুড়ে চাহিদা ব্যাপক।

ইতিহাস

১৯৫১ সালে সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস 'ড্রাগন'স আইল্যান্ড'-এ 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জ্যাক উইলিয়ামসন। তার এক বছর আগে ডিএনএ যে বংশগতির বাহক তা নিশ্চিত করেন আলফ্রেড হের্শেয় ও মার্থা চেজ। রবার্ট বুইয়ার ও রবার্ট সয়ানসন ১৯৭৬ সালে বিশ্বের প্রথম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি 'জেনেটেক' প্রতিষ্ঠা করেন। এর এক বছর পর জেনেটিক ই কোলাই ব্যাকটেরিয়া থেকে মানব প্রোটিন সোমাটোস্ট্যাটিন উৎপাদন করে, যা হিউম্যান ইনসুলিন হিসেবে সুপরিচিত। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে চীন ভাইরাস প্রতিরোধকারী তামাকগাছের প্রবর্তনের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদকে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক রূপ দান করে। বাংলাদেশের এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয় পাট এবং এর পরজীবী ছত্রাকের জিন নকশা আবিষ্কার।

কেন পড়বেন

বর্তমান বিশ্বে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন, মানুষের মৃত্যুকে জয় করার ইচ্ছা, শিল্প উৎপাদন, পরিবেশ রক্ষাসহ মানবজীবনের নানা চাহিদা মেটাতে কাজ করছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। মেডিক্যাল সায়েন্স এবং ফার্মাসিউটিক্যালস ও কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রির জীবন রক্ষাকারী ওষুধ উৎপাদন, অ্যানজাইম ও হরমোন উৎপাদনে এ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আণুবীক্ষণিক জীব যেমন–ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট অথবা ইনসেক্টম্যামালিয়ান সেল ইত্যাদি থেকে বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করা যায়। জিন প্রযুক্তি দ্বারা উন্নীত ফসল (জিএমসি) ও জিনগত পরিবর্তন সংবলিত জীব (জিএমও) হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি বিতর্কের বিষয়। তবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত কৃষিকে ঘিরেই বেশি পরিচালিত হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে কৃষিতে জিন প্রযুক্তি দ্বারা উন্নীত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে–পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের হুমকি থেকে শস্যকে রক্ষা করা, শস্য থেকে সম্পন্ন নতুন উপাদান উৎপাদন করা, শস্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা, শস্যের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি।

কী পড়ানো হয়

অ্যাপ্লায়েড বায়োলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়ে পাঠদান করা হয়। বিশেষ কিছু বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় প্লান্ট বায়োটেকনোলজি, অ্যানিমেল বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়াল বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি, ফুড বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি, মেডিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস বায়োটেকনোলজি, প্লান্ট টিস্যু কালচার, অ্যানিমেল সেল টেকনোলজি, বায়োপ্রসেস টেকনোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। সহায়তা বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় অ্যানিমেল সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল বোটানি, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োস্ট্যাটিসটিকস, মলিকুলার বায়োলজি ও জেনেটিকস।

ভর্তির যোগ্যতা

এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগ থাকতে হবে। সাবজেক্টের তালিকায় অবশ্যই বায়োলজি থাকতে হবে। দেশের একাধিক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি'তে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স চালু আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ উল্লেখযোগ্য।

ক্যারিয়ার সম্ভাবনা

জেনেটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত। সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা কর্মরত। বাংলাদেশের কিছু ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বায়োটেক ড্রাগ উৎপাদন শুরু করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানেও পেশা গড়ার সুযোগ রয়েছে এ বিষয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদের। উন্নত বিশ্বেও রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা ও কাজের সুযোগ।

■ শামস বিশ্বাস

আমাদের সময় ২৪ মে ২০১৭

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১২ ছাত্র

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	মো. হাসান মাহমুদ ৯৯৫/২০১২ গ্রাম: উলাট, ডাকঘর: কাদোয়া, থানা: সুজানগর, জেলা: পাবনা। মোবাইল: ০১৭৩৫-৯০৭০১৩	এমবিবিএস, ৪র্থ বর্ষ রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।
২.	মো. রকিবুজ্জামান রকি ৯৯৬/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: গংগাচড়া, থানা: গংগাচড়া, জেলা: রংপুর। মোবাইল: ০১৭১৫-২৬৫৯১৩	বিএসসি, পদার্থবিজ্ঞান, ৪র্থ বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	মো. সাইদুর রহমান ৯৯৭/২০১২ গ্রাম: হাজরা ডাঙ্গা, ডাকঘর: সুন্দরদিঘী, থানা: দেবীগঞ্জ, জেলা: পঞ্চগড়। মোবাইল: ০১৭৬১-১৪০৩৩১	বিএসসি, এগ্রি বিজনেস, ২য় বর্ষ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪.	মো. মোরছালিন হক ৯৯৯/২০১২ গ্রাম: রনচন্ডী দক্ষিণ পাড়া (ভেতর বন্দ), ডাকঘর: খামারপাড়া গ্রাম থানা: কিশোরগঞ্জ জেলা: নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭৭৩-৩৬৭১৯৪	বিএসসি. ইঞ্জি, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৫.	মো. আব্দুল বাশির ১০০০/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: নয়াদিয়াড়ী, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭৭৩-৪৬৭৯২৩	বিএসসি, মাৎস্যবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে।
৬.	পরিমল চন্দ্র বর্মন ১০০১/২০১২ গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ইউনিয়ন: টংভাঙ্গা, ডাক ও থানা: হাতীবান্ধা জেলা: লালমনিরহাট। মোবাইল: ০১৭৬৩-৬০১০৪০	বিএ, ইতিহাস, ৩য় বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
৭.	মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সাব্বির ১০০২/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর: মেদিলা, থানা: ভালুকা, জেলা: ময়মনসিংহ। মোবাইল: ০১৭৬৭-১১৫৫৯৮	বিএসসি, প্রাণিবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
৮.	মো. মেহেদী হাসান গ্রাম: একবারপুর (দক্ষিণ পাড়া), ডাকঘর: গোপীগ্রাম, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর। মোবাইল: ০১৭৪৩-৭১৯৩৩৫	ডিভিএম, এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, ২য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯.	মো. আকরামুজ্জামান ১০০৫/২০১২ গ্রাম: ডাববা, ডাকঘর: শঠিবাড়ী, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৬৪৪৬৬	বিএসএস, সমাজবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১০.	মো. মাহফুজ ইয়ামিন ১০০৬/২০১২ গ্রাম: রূপসী বড়বাড়ি, ডাকঘর: লালপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর। মোবাইল: ০১৭৮২-৪৩১৫৪৪	বিএসসি. ইঞ্জি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় বর্ষ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা।
১১.	মো. আল আদিল সরদার ১০০৮/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘর : বিষ্ণুপুর, থানা: গাইবান্ধা সদর, জেলা: গাইবান্ধা। মোবাইল: ০১৭২৩-৯৭৫০৩৬, ০১৬৮২-৯৭২৬৩২	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল টেকনোলজি, ৪র্থ বর্ষ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১২ ছাত্র

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১২.	রুহুল আমিন ১০০৯/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘরঃ বাক্তা, থানাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ। মোবাইলঃ ০১৯৬২-৭৫৭২৭৯	বিএসএস, মনোবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৩	হিরন্ময় খাঁ ১০১১/২০১২ ৪২ ষষ্ঠিতলা পাড়া, বি.পি. রোড, কোতয়ালী, যশোর সদর, যশোর। মোবাইলঃ ০১৭৫৯-৭৪৬৩৭০	বিএ, ইংরেজি, ৩য় বর্ষ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যশোর।
১৪.	তূর্য্য অধিকারী ১০১৪/২০১২ ৪২ ষষ্ঠিতলা পাড়া, বি.পি. রোড, কোতয়ালী, যশোর সদর, যশোর। মোবাইলঃ ০১৭৬৭৯১১২৭০	বিবিএস, হিসাববিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ সরকারী মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর।
১৫.	মো. হাবীব আলী ১০১৫/২০১২ গ্রামঃ জোয়ারী, ডাকঘরঃ জোয়ারী বাজার, থানাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। মোবাইলঃ ০১৭৫৮১৬৯০৩২	বিএ, গ্রাফিক ডিজাইন ক্রাফ্ট এন্ড হিস্ট্রি অব আর্টস, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬.	মোহা. জুয়েল রেজা ১০১৭/২০১২ গ্রামঃ খোসালপাড়া (২), ডাকঘর ও থানাঃ গোমাস্তাপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মোবাইলঃ ০১৭৪৫-২৩৩২০৪	বিএ, ইতিহাস, ৩য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭.	মো. রমজান আলী খাঁন ১০১৮/২০১২ গ্রামঃ ধনঞ্জয়, ডাকঘরঃ ভোলারচওড়া, থানাঃ লালমনিরহাট সদও জেলাঃ লালমনিরহাট। মোবাইলঃ ০১৭৭৩৮০৮৬০৮	বিএসসি.এজি, এগ্রি-বিজনেস, ৩য় বর্ষ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
১৮.	মো. আসাদুল খাঁন ১০১৯/২০১২ গ্রামঃ কলারদোয়ানিয়া, থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর। মোবাইলঃ ০১৭৪৯-৩৭০০৬২	বিএসসি, গণিত, ৩ বর্ষ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।
১৯.	মো. সাজেদুর রহমান ১০২০/২০১২ গ্রামঃ তিরাইল, ডাকঘরঃ আগ্রান, থানাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। মোবাইলঃ ০১৭৩৪-২০৯১৬৭	বিবিএস, হিসাববিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারী কলেজ নাটোর।
২০.	নুরুল হক ১০২১/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘরঃ ধামর, থানাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ। মোবাইলঃ ০১৭২৫-৬০৩৫৬৫, ০১৫৫৪-৪২৯৫১৮	বিবিএস, হিসাববিজ্ঞান, ২য় বর্ষ ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর।
২১.	নাজমুল হক ১০২২/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘরঃ ধামর, থানাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ। মোবাইলঃ ০১৭৭৫-৬৭৩০১৪	বিবিএস, হিসাববিজ্ঞান ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর।
২২.	হাফিজ-আল-আসাদ ১০২৩/২০১২ গ্রামঃ মেদুলিয়া, ডাকঘরঃ ধল্লা বাজার, থানাঃ সিংগাইর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। মোবাইলঃ ০১৭৩৮-৫৭৩১৮৯	বিএ, দর্শন, ২য় বর্ষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৩.	মো. রাকিবুল হাসান (বসু) ১০২৪/২০১২ গ্রাম ও ডাকঘরঃ মেদিলা, থানাঃ ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ। মোবাইলঃ ০১৭২৪-৭৩৭৮৩৪, ০১৭৬০-৪৫৩৩৭৬	বিএসসি, প্রাণিবিদ্যা, ৩য় বর্ষ ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

ফোর জি কী?

মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের সর্বাধুনিক সংস্করণ ফোর-জি (4G-Fourth Generation)। এটি সম্পূর্ণরূপে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক একটি টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম যা গ্রাহককে Ultra-broadband mobile internet access প্রদান করে থাকে। ফোর জি প্রযুক্তি হচ্ছে থ্রিজি মোবাইলের আধুনিকতর সংস্করণ। এই প্রযুক্তি এখনও গ্রাহক পর্যায়ে সহজলভ্য হয়ে উঠেনি। ফোরজি মোবাইলের পুরোপুরি বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপণন শুরু হলে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফোর জি মোবাইল ব্যবহারের সুবিধা

- ফোর জি মোবাইলে রয়েছে সর্বোচ্চ গতির ডাটা ট্রান্সফারের সুবিধা।
- এই প্রযুক্তিতে গ্রাহক সর্বদাই মোবাইল অনলাইন ব্রডব্যান্ডের আওতায় থাকতে সমর্থ হবেন।
- এতে হাই ডেফিনেশন টেলিভিশন এবং ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধা পাওয়া যাবে।
- এই প্রযুক্তিতে গ্রাহকের কথোপকথন ও ডাটা ট্রান্সফারের নিরাপত্তা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।
- ফোর জি মোবাইল গ্রাহককে ভয়েস মেসেজ, ফ্যাক্স, মাল্টিমিডিয়া মেসেজ, অডিও ভিডিও রেকর্ডিং ইত্যাদির সুবিধাও প্রদান করবে।

হাজার বোঝাতে 'কে'-এর ব্যবহার এলো কীভাবে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম–বিশেষ করে ফেসবুকে লাইকের ক্ষেত্রে হাজার বোঝাতে ইংরেজি 'কে' অক্ষর ব্যবহার করা হয়। ধরুন, ফেসবুকে একটি পোস্টে আপনি সাত হাজার লাইক পেয়েছেন, সেক্ষেত্রে ফেসবুক দেখাবে 'সেভেন কে'।

এছাড়া হাজার টাকা বোঝাতেও অনেকে 'কে' অক্ষরটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন কারও মাসিক বেতন যদি ৩০ হাজার টাকা হয়, তাহলে অনেক সময় সেটা লেখা হয় '৩০কে'। জানেন কোথা থেকে এলো এই 'কে'?

প্রাচীন গ্রিসে হাজার বোঝাতে 'কিলিওই' শব্দটা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ১ হাজার বোঝানোর জন্য গ্রিকরা 'কিলিওই' ব্যবহার করতেন। পরে এই এককটি ব্যবহার করতে শুরু করেন ফরাসিরাও। ফ্রান্সে এসে গ্রিক শব্দ 'কিলিওই' বদলে হয়ে যায় 'কিলো'। ক্রমে মেট্রিক সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন ফরাসিরা। 'কিলো'কে ১ হাজার হিসেবে লিখতে শুরু করেন তারা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ১ হাজারের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু ১ হাজার গ্রামের বদলে ক্রমে প্রচলিত হয়ে ওঠে ১ কিলোগ্রাম। এভাবে কিলোলিটার, কিলোটনের মতো শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। এই শব্দগুলো একটু বড়ো। তাই সময় বাঁচাতে এক্ষেত্রে 'কে' লেখা শুরু হয়। এর ফলে ১০ হাজার হয়ে যায় '১০কে', ২০ হাজার হয়ে যায় '২০কে'। এরপর থেকেই হাজার বোঝাতে 'কে'-এর প্রচলন শুরু হয়।

কী বানানটা যেন কী?

আমরা অনেকেই মনে করি কি ও কী-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুটোর যেকোনো একটা লিখলেই চলে। কিন্তু বন্ধুরা, কি আর কী একেবারেই আলাদা। এদের পার্থক্য জানা থাকলে এবং ঠিকঠাক মতো শব্দ দুটোর প্রয়োগ ঘটালে বাক্যের অর্থ চট করে বুঝে ফেলা যায়।

যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেয়া যায়, সেসব প্রশ্নে 'কি' ব্যবহৃত হবে; আর যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে 'কী' ব্যবহৃত হবে। যেমন :

ক. i) তুমি কি খাবে? তুমি না খেলে খাবারটা ভিখিরিকে দিয়ে দেব।
ii) তুমি কী খাবে–ভাত না রুটি?

খ. i) তোমার নাম কী–রনি না জনি?
ii) তোমার বাবার নাম কি জহির?

গ. i) তুমি কী চাও–শার্ট না পাঞ্জাবি?
ii) তুমি কি চাও আমি তোমাকে পাঞ্জাবি কিনে দেই?

ঘ. i) কিছু ফেলে গেলেন কি?
ii) কী ফেলে গেলেন?

ঙ. i) দ্রব্যমূল্য যে বাড়ল, এর কি কোনো যৌক্তিক কারণ আছে?
ii) কী কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়ল?

চ. i) তুমি কি গান গাও? না নাচো?
ii) তুমি কী গান গাও–আধুনিক গান না ব্যান্ডের গান?

এখানে ক থেকে চ পর্যন্ত যে ছয় সেট উদাহরণ দেখলাম; সেখানে র-চিহ্নিত প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেওয়া যায় বলে সেগুলোতে 'কি' বসেছে, আর র-চিহ্নিত প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ বা না দ্বারা দেওয়া যায় না বলে সেগুলোতে 'কী' বসেছে।

বিবিধ উদাহরণ :

কি: i) তুমি কি কেবলই ছবি?
ii) তুমি কি সেই আগের মতোই আছো?
iii) সখী, ভালোবাসা কারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময়?
iv) আমার ছোটো তরি; বলো, যাবে কি?
v) আমি যা দেখি, তুমি কি তা দ্যাখো?

কী: i) কী করি আজ ভেবে না পাই!
ii) পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!
iii) কী গান শোনাব, ওগো বন্ধু?
iv) কী এমন দুঃখ তোমার?
v) তোমাকে দেয়ার মতো কীই বা আছে আমার!

বিস্ময়সূচক বাক্যে বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন :
i) সে কী, দাদা! অর্ধেকটা ডিমের পুরোটাই খেয়ে ফেললেন!
ii) আহা! কী যে ভালো লাগল!
iii) সময় কী দ্রুতই না কেটে যায়!
iv) মুস্তাফিজ রোহিতকে কী নাকানিচুবানিটাই না খাওয়াল!
v) এ কী! হচ্ছেটা কী!
vi) কী ঘুমটাই না ঘুমালাম! কী শান্তি!

তবে বাক্যে অব্যয় পদ হিশেবে ব্যবহৃত হলে 'কি' লিখতে হবে। যেমন :
i) কি ব্যাটিং, কি বোলিং–সাকিব দুটোতেই বিশ্বসেরা।
ii) কি গণিত, কি ইংরেজি–দুটোতেই সে সমান পারদর্শী।
iii) দিন কি রাতে, সাঁঝ-প্রভাতে; তোমারই আছি এই তো।

এমনকি, নাকি, কিসে, বৈকি ইত্যাদি শব্দে ক-এ ই-কার বসবে।
এখন থেকে আমরা কি আর কী-এর সঠিক প্রয়োগ করব এবং ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখব।

আইএমইআই নাম্বার কী? আইএমইআই নাম্বার দেখবেন কীভাবে?

আইএমইআই (IMEI) এর পূর্ণরূপ হলো International Mobile Equipment Identity। এই IMEI প্রতিটি মোবাইল ডিভাইসের জন্য একটি সংখ্যাসূচক পরিচয় বা সংখ্যাসূচক আইডিন্টিটি। আর এই কারণে প্রতিটি আইএমইআই নম্বরই অনন্য তথা একটি আরেকটির থেকে ভিন্ন।

আপনি অনেক উপায়ে আইএমইআই (IMEI) নম্বরটি দেখতে পারেন। তবে আমার কাছে ফোনের ডায়ালার অ্যাপ থেকে এই নম্বরটি চেক করা সবচাইতে সহজ লাগে। আপনার ফোনের ডায়ালার অ্যাপে *#06# ডায়াল করলেই ফোনের আইএমইআই নম্বরটি দেখতে পারবেন।

আবার এন্ড্রয়েড ডিভাইসের Settings>About>Phone>Status এ গিয়ে আপনি আপনার IMEI নম্বরটি দেখতে পারবেন। আবার অ্যাপেল ইউজাররা Settings>General>About এ গিয়ে IMEI নম্বর দেখতে পারবেন। আপনার আপনার ফোনের বক্সে এবং ওয়ারেন্টি কার্ডেও আপনি IMEI নম্বরটি খুঁজে পাবেন। যাই হোক, যেখান থেকেই দেখুন না কেন, অবশ্যই নম্বরটি নোট করে রাখবেন।

নবান্ন উৎসব কখন থেকে চালু হলো

নবান্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। বাংলার কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। নবান্ন উৎসব হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু রীতিতে নবান্ন একটা পূজাও বটে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নবান্ন অনুষ্ঠানে নতুন অন্ন পিতৃপুরুষ, দেবতা, কাক ইত্যাদি প্রাণীকে উৎসর্গ করে এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করার পর গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ নতুন গুড় সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করেন। নবান্ন উৎসব হিন্দুদের একটি প্রাচীন প্রথা। একসময় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে যেন পিঠা-পায়েসের ধুম পড়ে যেত। আমন্ত্রণ জানানো হতো আত্মীয়-পরিজনকে। দেশের নানা জায়গায় আয়োজন করা হতো পিঠামেলার। একদা শুধুমাত্র হিন্দুরা অত্যন্ত সাড়ম্বরে নবান্ন উৎসব পালন করত, পরবর্তীতে সকল মানুষের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসেবে নবান্ন উৎসব সমাদৃত ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। জাতীয় নবান্নোৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ প্রতিবছর পহেলা অগ্রহায়ণ তারিখে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করে। নবান্ন উৎসব বাংলার মানুষের কাছে এক অতি আপন সংস্কৃতি, যা বাঙালি মননের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ছবি : হোমেজ টু এমব্রয়ডারেড কুইল্ট-১ | মাধ্যম : তেলরং | শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

ছবি : পরিবার | মাধ্যম : অ্যাক্রেলিক | শিল্পী : রফিকুন নবী

নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন